POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023--2025

আল্লাহ্‌র বাণী

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ

হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা সাড়া দাও আল্লাহ্‌ এবং তাঁহার রসুলের ডাকে, যখন সে তোমাদিগকে ডাক দেয় যেন সে তোমাদিগকে জীবিত করিতে পারে।

(সূরা আনফাল: ২৫)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ

খণ্ড 9

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 3

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 18 Jan, 2024 5 রজব 1445 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

রসুলুল্লাহ্‌ (সা.)-এর বাণী

আল্লাহ্‌ তা'লার নির্ধারিত সীমার উপর প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি

২৪৯৩) হযরত আকাবা বিন আমির (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে রসুলুল্লাহ্‌ (সা.) সাহাবাদের মাঝে বিতরণের জন্য তাঁকে কয়েকটি বকরী প্রদান করেন। এই বকরীগুলি কুরবানীর জন্য ছিল। এর মধ্য থেকে একটি এক বছরের শাবক অবশিষ্ট থেকে যায়। হযরত আকাবা (রা.) রসুলুল্লাহ্‌ (সা.) কে সে কথা অবগত করেন। আঁ হযরত (সা.) বললেন, এটির কুরবানী তুমি নিজে করে নাও।

২৫০১/২) আব্দুল্লাহ্‌ বিন হিশাম এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি নবী (সা.) এর যুগ পেয়েছিলেন। তাঁর মা হযরত যয়নব বিনতে হামীদ তাঁকে রসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে নিয়ে আসেন। (হযরত যয়নব বললেন:) হে রসুলুল্লাহ্‌! এই শিশুটির বয়আত গ্রহণ করুন। আঁ হযরত (সা.) বললেন, সে এখন শিশু। আঁ হযরত (সা.) তার মাথায় হাত বুলিয়ে তার জন্য দোয়া করেন।

(সহীহ বুখারী, ৪র্থ খণ্ড, কিতাবুশ শিরকাহ)

এই সংখ্যায়

খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ১৭ ও ২৪ শে নভেম্বর ২০২৩
হুযুর আনোয়ার (আই.) এর অনলাইন সাক্ষাত

একথা মনে করো না যে পার্থিব কোন ধন-সম্পত্তি বা শাসনক্ষমতা, সম্পদ,সম্মান, বংশের জোর কোন ব্যক্তির জন্য কোন প্রশান্তির কারণ হলে সত্যিকার অর্থেও সে জান্নাতে রয়েছে। কক্ষনো নয়। যে প্রশান্তি ও আনন্দ জান্নাতের পুরস্কার হিসেবে পাওয়া যায় তা এই সব বিষয় দ্বারা অর্জিত হয় না, সেটা অর্জিত হয় খোদার মাঝেই জীবিত থাকা এবং খোদার মাঝেই মৃত্যু বরণ করার মাধ্যমে।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর বাণী

খোদা তা'লার পথে আত্মোৎসর্গ করুন

এখন বোঝা উচিত যে জাহান্নাম কি জিনিস? একটি জাহান্নাম পরকালের যার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ্‌ তা'লা দিয়ে রেখেছেন। দ্বিতীয়তটি হল, এই জীবনও এক প্রকার জাহান্নাম যদি না সেটি খোদার জন্য উৎসর্গিত হয়। এমন ব্যক্তিকে দুঃখ-কষ্ট থেকে রক্ষা করার এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দান করার দায়িত্ব আল্লাহ্‌ তা'লার নয়। একথা মনে করো না যে পার্থিব কোন ধন-সম্পত্তি বা শাসনক্ষমতা, সম্পদ,সম্মান, বংশের গৌরব কোন ব্যক্তির জন্য কোন প্রশান্তির কারণ হলে সত্যিকার অর্থেও সে জান্নাতে রয়েছে। কক্ষনো নয়। যে প্রশান্তি ও আনন্দ জান্নাতের পুরস্কার হিসেবে পাওয়া যায় তা এই সব বিষয় দ্বারা অর্জিত হয় না, সেটা অর্জিত হয় খোদার মাঝেই জীবিত থাকা এবং খোদার মাঝেই মৃত্যু বরণ করার মাধ্যমে। যার জন্য আম্বিয়া (আ.), বিশেষ করে হযরত ইব্রাহিম (আ.) এবং ইয়াকুব (আ.) এই উপদেশই দান করেছিলেন- لَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (আল বাকারা: ১৩৩) পার্থিব আনন্দ ও সুখানুভব তো এক প্রকারের কলুষিত বাসনা সৃষ্টি করে মানুষের চাহিদা ও তেষ্টাকে বাড়িয়ে তোলে। পলিডেপসিয়া রোগীর ন্যায় কখনও তার তেষ্টা মেটে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে মারা যায়।

অতএব, এই অনর্থক কামনা বাসনার আগুনও পূর্বোক্ত জাহান্নামেরই আগুন যা মানুষের মনকে শান্তি ও স্বস্তি দেয় না। বরং তা অস্থিরতা ও উৎকণ্ঠায় দগ্ধ করে। তাই আমার বন্ধুদের দৃষ্টি থেকে এই বিষয়টি যেন মোটেই গোপন না থাকে যে, মানুষ যেন ধন-সম্পদ, স্ত্রী ও পুত্রের ভালবাসায় এমন আত্মহারা ও মোহাচ্ছন্ন না হয়ে পড়ে যা তার এবং খোদার মাঝে অন্তরায় সৃষ্টি করে। সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিকে এই কারণেই পরীক্ষা বলা হয়। এগুলোও মানুষকে দোযখের দিকে নিয়ে যায়। আর যখন এদেরকে তার থেকে পৃথক করা হয় তখন সে ভীষণ অস্থিরতা এবং উৎকণ্ঠা ব্যক্ত করে। এমতাবস্থায় نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ (الهمزة আল হুমাযাহ, আয়াত: ৭,৮) আয়াতটি আর আক্ষরিক থাকে না। বস্তুত, এই শব্দগুলি তাদের সামনে মূর্তিমান হয়ে ওঠে। অতএব, যে আগুন মানুষের হৃদয়কে পুড়িয়ে ভস্মিভূত করে দেয় এবং কয়লার চেয়েও কালো ও অন্ধকারময় বানিয়ে দেয় সেটা হল আল্লাহ্‌ ভিন্ন অন্য কোন সত্তার প্রতি ভালবাসা। (মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৫০৩)

খৃষ্টানগণ যেহেতু হযরত মসীহকে অস্বাভাবিক মহত্ব দান করে থাকে এবং দাবি করে যে তাঁর মাঝে কিছু কিছু অনন্য বৈশিষ্ট্য পাওয়া যেত। এই কারণে আল্লাহ্‌ তা'লা এখানে সেই দাবি খণ্ডন করেছেন এবং বলেছেন যে, এই গুণগুলি হযরত এহিয়া (আ.)এর মাঝেও বিদ্যমান ছিল।

وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا-

এবং সে পিতামাতার প্রতি সদাচারী ছিল, এবং সে উগ্র , অবাধ্য ছিল না।

(সূরা মরিয়ম, আয়াত: ১৫)

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন: এবং তিনি উগ্র এবং অবাধ্য ছিলেন না।

আল্লাহ্‌ তা'লা হযরত এহিয়া (আ.)-এর যে সকল গুণাবলীর বর্ণনা করেছেন তার কারণ হল, খৃষ্টবাদীরা হযরত মসীহ সম্পর্কে দাবি করেন যে, তিনি কতই না উচ্চ মানের শিক্ষা দান করেছেন- যে কেউ তোমার ডান গালে চড় মেরেছে তার সামনে অপর দিকের গালটিও পেতে দাও।"

(ইঞ্জিল, মতি, অধ্যায়-৫, আয়াত: ৩৯)

আল্লাহ্‌ তা'লা বলেন, এহিয়াও উগ্র ছিল না। তিনি যে শিক্ষা নিয়ে এসেছিলেন তাতেও জুলুমের কোনও দিক ছিল না। অনুরূপভাবে খৃষ্টবাদীরা হযরত মসীহর আরও একটি মহত গুণের উল্লেখ করে যেখানে তিনি বলেছে- যেটি সম্রাটের তা সম্রাটকে দাও আর যেটি খোদার সেটি খোদাকে দাও।"

(ইঞ্জিল, মতি, অধ্যায়-২২, আয়াত: ২১)

আল্লাহ্‌ তা'লা বলেন, এহিয়াও অবাধ্য ছিল না। সেও এই শিক্ষা নিয়ে এসেছিল যে, অবাধ্যতা করো না, সম্রাটের অধিকার সম্রাটকে দাও আর খোদার অধিকার খোদাকে দাও।

বস্তুত হযরত মসীহ্‌র যে সমস্ত গুণাবলী বর্ণনা করা হয়, সেগুলি আল্লাহ্‌ তা'লা নিজের পক্ষ থেকে হযরত এহিয়া (আ.)কেও দান করেছিলেন। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, হযরত এহিয়া

এরপর শেষ পাতায়...

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

জুমআর খুতবা

আমাদের কাছে তো দোয়াই একমাত্র অস্ত্র। প্রত্যেক আহমদীকে এই অস্ত্র আগের থেকে বেশি করে ব্যবহার করা উচিত।

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন যে, রসুলুল্লাহ্ (সা.) বিবাহের পর আমাকে বলেন, বিবাহের পূর্বে আমাকে স্বপ্নে দু'বার তোমাকে দেখানো হয়েছে। আমি দেখেছি একজন ফিরিশতা তোমাকে রেশমের ঝুড়িতে তুলে রেখেছে।

নীতিগতভাবে আয়েশার বিয়ের বয়সের বিষয়টি তেমন বিচিত্র কিছু ছিল না যা সেখানকার মানুষদের মাঝে আপত্তি বা প্রশ্ন তুলতে পারত।

'হযরত আয়েশার বয়স নয় বছর হওয়া ভিত্তিহীন কথাবার্তা। কোন হাদীস কিম্বা কুরআন থেকে তা প্রমাণ হয় না।"

[হযরত মসীহ মওউদ (আ.)]

রসুলুল্লাহ্ (সা.) বলতেন, আমার সকল কন্যাদের মধ্য থেকে যয়নব সর্বোত্তম, কারণ তাকে আমার জন্য কষ্ট পোহাতে হয়েছে।

ইসলাম যুদ্ধ পরিস্থিতিতেও মহিলা ও শিশু এবং সেই সব লোকদের হত্যা করার অনুমতি দেয় না যারা কোনওভাবেই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করছে না। আঁ হযরত (সা.) অত্যন্ত কঠোরভাবে এর নির্দেশও দিয়ে রেখেছেন।

যদি সত্যিকার ন্যায় প্রতিষ্ঠিত করা হত তবে এসব কিছুই হত না। যদি পরাশক্তিগুলি নিজেদের দ্বৈতনীতি অনুসরণ না করত বা না করে, তবে পৃথিবীতে এই ধরণের অশান্তি ও যুদ্ধ-বিগ্রহ হতেই পারে না। অতএব, এই দ্বৈতনীতির অবসান ঘটলে স্বাভাবিক নিয়েমে যুদ্ধ-বিগ্রহেরও অবসান ঘটবে।

এমন পরিস্থিতিতে মুসলমান দেশগুলির অন্তত ঘুম ভাঙ্গা উচিত। নিজেদের মধ্যেকার মতানৈক্য দুর করে নিজেদের ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করা উচিত।

যদি একতা থাকে, তবে প্রতিবাদের কণ্ঠও জোরালো হবে, অন্যথায় নিরপরাধ মুসলমানদের প্রাণহানির জন্য এরাই দায়ী থাকবে, মুসলমান দেশগুলি দায়ী থাকবে।

আঁ হযরত (সা.) এর নির্দেশ সব সময় দৃষ্টিপটে রাখা উচিত এবং সেই সব শক্তিগুলির কাজ এই নির্দেশকে দৃষ্টিপটে রাখা। নির্দেশটি হল অত্যাচারী এবং অত্যাচারিত উভয়কে সাহায্য কর।

হযরত আয়েশা (রা.) এর সঙ্গে নবী করীম (সা.)-এর বিবাহের অন্তর্নিহিত প্রজ্ঞা, বিবাহের সময় হযরত আয়েশার বয়স নিয়ে আপত্তির বিশ্লেষণাত্মক উত্তর,হযরত যয়নব বিনতে রসুলুল্লাহ্ (সা.) এর মদিনায় হিজরতের বিস্তারিত বিবরণ।

ইসরাঈল ও ফিলিস্তীনের মাঝে যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে দোয়ার আহ্বান এবং বিশ্ব-নেতাদের উদ্দেশ্যে উপদেশ বাণী।

মাননীয় ডক্টর বশীর আহমদ খান সাহেব (যুক্তরাজ্য)-এর জানাযা(হাজির) এবং ডক্টর শফিক সেহগল সাহেব (সাবেক আমীর,জেলা-মুলতান) এর স্ত্রী ওয়াসীমা বেগম সাহেবার জানাযা গায়েব, এবং মরহুমীনদের স্মৃতিচারণা।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ১৩ ই অক্টোবর , ২০২৩, এর জুমুআর খুতবা (১৩ই ইখা, ১৪০২ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আঁ হযরত (সা.)-এ জীবনের কতিপয় ঘটনাবলী যা বদরের যুদ্ধের সময় বা এর অব্যবহিত পরে সংঘটিত হয়েছিল সেগুলির বর্ণনা চলছিল। এই সব ঘটনাবলীতে আঁ হযরত (সা.)-এর সঙ্গে হযরত আয়েশা (রা.)-এর বিবাহের উল্লেখও ছিল। তাই এই ঘটনাটি বর্ণনা করছি। উম্মুল মোমেনীন হযরত খাদিজা (রা.) এর মৃত্যুর পর একদিন হযরত উসমান বিন মাযউন (রা.)-এর স্ত্রী খাওলা বিনতে হাকীম রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করেন, 'হে আল্লাহ্র রসুল! আপনি কি বিবাহ করতে চান না? আপনি কাউকে বলেছেন? আপনি চাইলে যুবতী মেয়েকেও বিয়ে করতে পারেন। আর যদি কোন বিধবাকে বিয়ে করতে চান তবে সেটাও হতে পারে। আঁ হযরত (সা.) বললেন, যুবতী কে আছে? তাঁকে জানানো হয় আয়েশা বিনতে আবু বকরের কথা। অতঃপর নবী (সা.) জিজ্ঞাসা করেন,বিধবা কে আছে? তিনি বলেন, সাউদা বিনতে যামাআ। সে আপনার উপর ঈমান এনেছে এবং আপনার আনুগত্যও করছে। রসুলুলুল্লাহ্ (সা.) হযরত খাউলাকে বললেন, তাদের উভয়ের অভিভাবকদের সঙ্গে আমার বিষয়ে কথা বল। রসুলুল্লাহ্ (সা.) এর কাছ থেকে অনুমতি পেয়ে হযরত খাউলা সেখান থেকে প্রস্থান করেন এবং প্রথমে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)এর বাড়ি যান হযরত আয়েশার বিবাহ প্রস্তাব নিয়ে। বাড়িতে হযরত আবু বকর (রা.) উপস্থিত ছিলেন না। তবে তাঁর স্ত্রী হযরত উম্মে রোমান ছিলেন। হযরত খাউলা (রা.) তাঁর সঙ্গে কথা বলেন এবং তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, উম্মে রোমান! মহাসম্মানিত আল্লাহ্ আপনাকে কতই না অসাধারণ আশিস ও কল্যাণে ভূষিত করেছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করেন সে আশিস ও কল্যাণের বিষয়টি কি? হযরত খাউলা (রা.) বলেন, আমাকে রসুলুল্লাহ্ (সা.) আয়েশার সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব প্রেরণ করেছেন। উম্মে রোমান বললেন, তবে আবু বকরের আগমণের অপেক্ষা কর। কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর হযরত আবু বকর (রা.) গৃহে প্রবেশ করলে হযরত খাউলা (রা.) তাঁকেও সেই সব কথা বলেন যা তিনি উম্মে রোমানকে বলেছিলেন। হযরত আবু বকর (রা.) জানতে চান যে, খাউলা, আমাকে বল যে, সেই আাশিস ও কল্যাণের বিষয়টি কি? হযরত খাউলা (রা.) বলেন, আমাকে রসুলুল্লাহ্ (সা.) প্রেরণ করেছেন। আমি তাঁর পক্ষ থেকে আয়েশার বিবাহ প্রস্তাব নিয়ে এসেছি। একথা শুনে হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, আয়েশার সঙ্গে তাঁর নিকাহ কি ঠিক হবে? আঁ হযরত (সা.)-এর ভাইয়ের মেয়ে। তাঁর একথা মনে পড়তে হযরত খাউলা (রা.) ফিরে যান এবং রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে হযরত আবু বকরের সেই কথা নিবেদন করেন। রসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, পুনরায় তাঁর কাছে গিয়ে বল, আমি ইসলামের নিরিখে তোমার ভাই এবং তুমি আমার ভাই। তোমার মেয়ের সঙ্গে আমার নিকাহ হওয়া সম্ভব। শরিয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে এতে কোন অন্তরায় নেই। হযরত খাউলা পুনরায় হযরত আবু বকর (রা.)-এর সঙ্গে কথা বলেন। তিনি (রা.) বলেন, অপেক্ষা কর। তিনি বেরিয়ে যান। হযরত উম্মে রোমান বলেন, মুতইম বিন আদ্দি তার ছেলের জন্য আয়েশার কথা বলেছিল। আল্লাহ্র

কসম! আবু বকর কখনও এমন কোন অঙ্গীকার করেন নি যা তিনি ভঙ্গ করেছেন। তাই আবু বকর মুতইম বিন আদ্দীর কাছে যান এবং তাঁর সাথে তাঁর স্ত্রী উম্মুল ফাতাও ছিল। সেই মহিলা বলল, হে কাহাফার পুত্র! যদি আমি তোমার ঘরে আমার ছেলের বিয়ে দিই, তবে হতে পারে তুমি তাকে নিজের ধর্মের অন্তর্ভুক্ত করে নিবে। হযরত আবু বকর (রা.) মুতইম বিন আদ্দীকে বলেন, তুমিও কি একই কথা বলছ? স্বামী স্ত্রী উভয়কেই তিনি জিজ্ঞাসা করেন। সে উত্তর দিল, সে যেমনটি বলেছে আমারও সেই একই একথা। হযরত আবু বকর (রা.) মুতইম এর কাছ থেকে ফিরে আসেন আর আল্লাহ্ তা'লা তাঁর হৃদয়কে সেই অঙ্গীকারের বিষয়ে অব্যহতি দান করেন। যখন সে বলল, আমাদের ছেলে মুসলমান হতে পারবে না, তখন এই বিয়ের প্রস্তাব নাকচ হয়ে গেল এবং সেই দ্বিধা-দ্বন্দ দূর হয়ে গেল। যে বিষয়ের অঙ্গীকার করেছি, যদি তুমি প্রস্তাব প্রেরণ কর তবে আমরা তা পূর্ণ করব= এই বাধ্যবাধকতাও থাকল না। অতঃপর তিনি হযরত খাওলা (রা.) কে বললেন, আমার পক্ষ থেকে রসুলুল্লাহ্ (সা.) সংবাদ পোঁছে দিও। হযরত খাওলা (রা.) আঁ হযরত (সা.)কে সংবাদ পোঁছে দেন অতঃপর আঁ হযরত (সা.) হযরত আয়েশার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। উক্ত ঘটনা মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল এর লিপিবদ্ধ আছে।

(মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ৮ম খন্ড,পৃ: ৪০৯-৪১০) (হাদীস-২৬২৮৮)(দায়েরায়ে মারেফ, সীরাত মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.), ৫ম খণ্ড, পৃ: ৪৪২-৪৪৩)

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন যে, রসুলুল্লাহ্ (সা.) বিবাহের পর আমাকে বলেন, বিবাহের পূর্বে আমাকে স্বপ্নে দু'বার তোমাকে দেখানো হয়েছে। আমি দেখেছি একজন ফিরিশতা তোমাকে রেশমের ঝুড়িতে তুলে রেখেছে।

অপর এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, সে (ফিরিশতা) বলল, এ হল আপনার পবিত্র সহধর্মিনী। আমি তাকে বললাম পর্দা অপসারিত কর। পর্দা অপসারিত হলে দেখলাম এটা তুমি। আমার মনে হল, এটা যদি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হয় তবে তিনি তা পূর্ণ করে দিবেন। এই রেওয়ায়েত বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে হযরত আয়েশা (রা.) এর পক্ষ থেকে।

(সহীহ বুখারী,কিতাবুত তাবীর, হাদীস-৭০১১ ও ৭০১২)

সাহাবাদের জীবনী গ্রন্থ আল ইসতিয়াব এ হযরত আয়েশা (রা.)-এর পক্ষ থেকে একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, একবার হযরত আবু বকর (রা.) রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর সমীপে নিবেদন করেন হে রসুলুল্লাহ! আপনি আপনার স্ত্রীর রুখসতি কেন করছেন না। আয়েশার সঙ্গে বিয়ে হয়ে বিবাহ হয় কিন্তু রুখসতি হয় নি। হযরত আবু বকর (রা.) নিজে থেকে বলেন, রুখসতি কেন করছেন না? আঁ হযরত (সা.) বললেন, মোহরের অর্থের কারণে। হযরত আবু বকর (রা.) আঁ হযরত (সা.)কে সাড়ে বারো আউকিয়া প্রদান করেন। এক আউকিয়া চল্লিশ দিরহামের সমতুল্য। তিনি (সা.) সেই টাকা অর্থাৎ মোহরের অর্থ আমার বাড়িতে পোঁছে দেন।

(আসসীরাতুল হালবিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৬৭)

বিবাহের সময় হযরত আয়েশার বয়সের বিষয়টি নিয়ে ইতিহাস বিশারদ, জীবনীকার ও পরবতীকালে রাভীদের বর্ণনার কারণে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়েছে। অমুসলিমরাও বিষয়টি নিয়ে অনেক আপত্তি উত্থাপন করে থাকে। অন্যথায় নীতিগতভাবে আয়েশার বিয়ের বয়সের বিষয়টি তেমন বিচিত্র কিছু ছিল না যা সেখানকার মানুষদের মাঝে আপত্তি বা প্রশ্ন তুলতে পারত।

যদি বিস্ময়করভাবে কোন অসাধারণ কোন বিষয় হত তবে মুনাফিক বা বিরোধিরা আপত্তির বন্যায় বইয়ে দিত। কিন্তু কোন পুস্তকে এমন কোন আপত্তির উল্লেখ পাওয়া যায় না। যে সব পুস্তকে হযরত আয়েশাকে নিতান্ত অপরিণত বালিকা হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে, 'হাকাম' (ন্যায়-বিচারক) ও 'আদল' (মীমাংসাকারী) হযরত মসীহ মওউদ (আ.) সেগুলিকে ভিত্তিহীন বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেন, 'হযরত আয়েশার বয়স নয় বছর হওয়া ভিত্তিহীন কথাবার্তা। কোন হাদীস কিম্বা কুরআন থেকে তা প্রমাণ হয় না।" (আর্য ধরম, রূহানী খাযায়েন, ১০ম খণ্ড, পৃ: ৬৪)

হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম.এ হযরত আয়েশার রুখসতির বিবরণ দিতে গিয়ে লেখেন, 'হযরত খাদিজা (রা.)-এর মৃত্যুর পর আঁ হযরত (সা.) হযরত আয়েশা (রা.)-এর সঙ্গে বিবাহ করেন। এটি ছিল ১০ম নববী সনের শওয়াল মাস। সেই সময় হযরত আয়েশা (রা.)-এর বয়স (যখন বিবাহ হয়) ছিল সাত বছর। কিন্তু এমনটি প্রতীত হয় যে সেই সময় তাঁর শারিরিক বিকাশ একটু বেশিই ছিল। অন্যথায় খাওলা বিনতে হাকীমের দৃষ্টি তাঁর দিকে যাওয়ার কোন কারণ ছিল না, যিনি আঁ হযরত (সা.)-এর সঙ্গে তাঁর বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন। তবে সেই সময় তিনি সাবালিকা ছিলেন না। তাই বিয়ে হলেও রুখসাতি হয় নি এবং নিয়ম মেনে নিজের পিত্রালয়ে অবস্থান করেছেন। কিন্তু হিজরতের দ্বিতীয় বছর যখন তাঁদের বিবাহের (নিকাহর) পাঁচ বছর অতিক্রান্ত হল, এবং তিনি সাবালিকা হয়ে উঠলেন, তখন হযরত আবু বকর (রা.) নিজে আঁহযরত (সা.) এর সমীপে উপস্থিত হয়ে রুখসতির আবেদন করেন। তাঁর কথা শুনে আঁ হযরত (সা.) মোহর পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। .... ২য় হিজরী সনের মাসে হযরত আয়েশা (রা.) তাঁর পিত্রালয়কে বিদায় জানিয়ে নবী (সা.)-এর দাম্পত্য জীবনে প্রবেশ করেন।"

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, প্রণেতা-মির্যা বশীর আহমদ এম.এ, পৃ: ৪২৩)

হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম.এ হযরত আয়েশা (রা.)-এর বিশেষত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে লেখেন,'স্বল্প বয়স সত্ত্বেও হযরত আয়েশা (রা.)-এর বুদ্ধি এবং স্মরণ -শক্তি অসাধারণ ছিল। আঁ হযরত (সা.)-এর তত্ত্বাবধানে শিক্ষা-দীক্ষায় তিনি অতি দ্রুত উন্নতি করেছিলেন যা একথায় নজিরবিহীন ছিল। বস্তুতঃ অল্প বয়সে তাঁকে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসার পিছনে আঁ হযরত (সা.)-এর এটাই উদ্দেশ্য ছিল যাতে তিনি বাল্যাবস্থা থেকেই নিজের মত করে শিক্ষিত করে তুলতে পারেন এবং তিনি দীর্ঘ সময় পর্যন্ত আঁ হযরত (সা.)-এর কল্যাণময় সান্নিধ্য লাভ করার সুযোগ পান এবং তাঁকে সেই মহান ও সংবেদনশীল কাজের দায়িত্ব পালনের যোগ্য করে গড়ে তোলা সম্ভব হয় যা একজন শরিয়তধারী নবীর সহধর্মিনীর উপর বর্তায়। আমরা দেখতে পাই তিনি (সা.) নিজের সেই উদ্দেশ্যে সফল হয়েছিলেন। আর হযরত আয়েশা (রা.) মুসলমান নারীদের সংশোধন ও শিক্ষা-দীক্ষার কাজ এমন সুচারুভাবে সম্পাদন করেন যার নজির ইতিহাসে পাওয়া যায় না। হাদীসের একটা অনেক বড় ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ হযরত আয়েশা (রা.)-এর পক্ষ বর্ণিত হাদীসসমূহের উপর টিকে আছে। এমনকি সেই বর্ণনাগুলির সংখ্যা দু' হাজার দু'শ দাঁড়ায়। তাঁর জ্ঞান, প্রতিভা, ধর্মের বিষয়ের খুঁটিনাটি ও চিন্তা-চেতনা এমন উচ্চাঙ্গের ছিল যে বড় বড় সাহাবা তাঁর অনুরাগী হয়েছিলেন এবং তাঁর থেকে কল্যাণমণ্ডিত হতেন। এমনকি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, আঁ হযরত (সা.) এর তিরোধানের পর সাহাবারা জ্ঞানগত বিষয়ে এমন কোন জটিলতার সম্মুখীন হন নি যার সমাধান হযরত আয়েশা (রা.)-এর কাছে পাওয়া যায় নি। আরওয়া বিন যুবায়ের বলেন, কুরআন, উত্তরাধিকার, হালাল ও হারাম, ফিকা, কবিতা, চিকিৎসাশাস্ত্র, আরবের ঘটনাবলী প্রভৃতি বিষয়ে আয়েশার থেকে বেশি জ্ঞানী কাউকে দেখি নি। অল্পে তুষ্ট থাকা এবং তাকওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর পদমর্যাদা ছিল অত্যুচ্চ।একবার কোথা থেকে এক লক্ষ দিরহাম তাঁর হস্তগত হয়। সন্ধ্যা হওয়ার পূর্বেই তিনি সব কিছু দান করে দেন। যদিও তাঁর ঘরে সন্ধ্যার আহারের জন্য কিছুই ছিল না। এই সকল প্রশংসনীয় গুণের কারণেই তিনি আঁ হযরত (সা.)-এর নিকট অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন, যেগুলির আভাস তিনি প্রাথমিক যুগেই পেয়েছিলেন। আঁ হযরত (সা.) একবার বলেন, 'পুরুষদের মধ্য থেকে বহু মানুষ এমন গত হয়েছেন যারা পরিপূর্ণ ছিলেন, কিন্তু নারী জাতির মধ্যে পূর্ণ মানবীর দৃষ্টান্ত অত্যন্ত বিরল। তিনি (সা.) ফিরাউন পত্নী আসিয়া এবং ইমরান তনয়া মরিয়মের নাম উল্লেখ করে বলেন, আয়েশা নারী জাতির মাঝে সেই মর্যাদার অধিকারী যেরূপে আরবের সর্বোৎকৃষ্ট খাদ্য 'সুরীদ' অন্যান্য খাদ্যের উপর শ্রেষ্ঠত্ব রাখে। একবার আঁ হযরত (সা.)-এর কয়েকজন সহধর্মিনী কোন পারিবারিক বিষয় নিয়ে হযরত আয়েশা সম্পর্কে কোন কথা বলে। আঁ হযরত (সা.) নীরব থাকেন। কিন্তু যখন বার বার সেই কথার পুনরাবৃত্তি করা হল, তখন তিনি বললেন, 'আমি তোমাদের এই অভিযোগ অনুযোগ নিয়ে কি করব? আমি কেবল এতটুকু জানি যে, কখনও কোন স্ত্রীর লেপের মধ্যে আমার উপর আমার খোদার ওহী নাযেল হয় নি। কিন্তু আয়েশার লেপের মধ্যে সব সময় ওহী নাযেল হয়। আল্লাহ্ আল্লাহ! কতই না পবিত্র সেই সহধর্মিনী ছিলেন যিনি এই মহান বিশেষত্বের অধিকারী ছিলেন। আর কতই না পবিত্র সেই স্বামী ছিলেন যাঁর স্ত্রীদের প্রতি ভালবাসার মানও পবিত্রতা ছাড়া কিছুই ছিল না। ..... হাদীসে একথারও উল্লেখ রয়েছে যে, শেষের দিনগুলোতে হযরত সাওদা বিনতে জামআ (রা.) তাঁর নিজের পালার দিনগুলো হযরত আয়েশাকে দিয়ে দিয়েছিলেন। আর এই রূপে হযরত আয়েশা (রা.) আঁ হযরত (সা.)-এর সান্নিধ্য থেকে কল্যাণমণ্ডিত হওয়ার দ্বিগুণ সুযোগ পেয়েছিলেন। ..... যেহেতু আঁ হযরত (সা.) হযরত আয়েশার তালিম-তরবীয়তের বিষয়ে বিশেষ যত্নবান ছিলেন আর তাঁর বয়স ও পরিস্থিতির নিরিখে বিশেষ মনোযোগ পাওয়া তাঁর অধিকার ছিল। এই কারণে আঁ হযরত (সা.) পালার বিষয় নিয়ে সাওদা (রা.) প্রস্তাবটি মঞ্জুর করে নেন। কিন্তু এর পরও তিনি (সা.) হযরত সাউদা (রা.) কাছে যথারীতি যেতেন এবং অন্যান্য স্ত্রীদের ন্যায় তাঁরও মনোরঞ্জন ও সুখ-স্বাচ্ছন্দেরর বিষয়ে যত্নবান ছিলেন।

হযরত আয়েশা (রা.) স্বাক্ষর হওয়ার বিষয়টি নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কিন্তু বুখারীর একটি হাদীস থেকে জানা যায় যে, তাঁর কাছে কুরআন করীমের একটি পাণ্ডলিপি ছিল। যা দেখে তিনি এক ইরাকি মুসলমানকে কয়েকটি আয়াতের শ্রুতি লিখন লিখতে দিয়েছিলেন। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে,

তিনি অন্তত শিক্ষিত অবশই ছিলেন। আর খুব সম্ভব তিনি রুখসাতানার পরই লেখা শিখেছিলেন। কিন্তু যেমনটি কতিপর্য ইতিহাসবিদ ব্যাখ্যা করেছেন তিনি হয়তো লিখতে জানতেন না। হযরত আয়েশা (রা.) আঁ হযরত (সা.)-এর মৃত্যুর পর প্রায় আটচল্লিশ বছর জীবিত ছিলেন। ৫৮ হিজরী সনের রমযান মাসে ইহধাম ত্যাগ করেন। সেই সময় তাঁর বয়স ছিল প্রায় ৬৮ বছর। " (সীরাত খাতামান্নাবীঈন, প্রণেতা- হযরত মির্যা বশীর আহমদ,এম.এ, পৃ: ৪৩০-৪৩২)

এরপর রয়েছে আঁ হযরত (সা.)-এর জীবনের আরও একটি ঘটনা যা বদরের যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই সংঘটিত হয়েছিল। এটি হল তাঁর কন্যা হযরত যয়নব (রা.)-এর ঘটনা যিনি মক্কায় ছিলেন এরপর তিনি মদিনায় চলে আসেন। আঁ হযরত (সা.) জামাতা আবুল আস বিন রাবী-ও বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে বন্দী হন। তাঁর স্ত্রী হযরত যয়নব (রা.) মক্কায় অবস্থান করছিলেন। তিনি (রা.) স্বামীর মুক্তিপণ হিসেবে নিজের গলার সেই হারটি প্রেরণ করেন যা তাঁর মা হযরত খাদিজা (রা.) তাঁকে বিয়ের সময় পরিয়েছিলেন।

এই মুক্তিপণ নিয়ে আসে আবুল আস এর ভাই আমর বিন রাবী। আঁ হযরত (সা.) সেই হারটি দেখে অত্যন্ত আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। তিনি সাহাবাদের বললেন, যদি উচিত মনে কর তবে যয়নবের বন্দীকে মুক্ত করে দাও এবং তার হারটিও ফেরত দিয়ে দাও। সাহাবাগণ বললেন, অবশ্যই, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আবুল আসকে মুক্ত করে দেওয়া হল। হযরত যয়নব (রা.)-এর হারটিও ফেরত দেওয়া হল, কিন্তু আঁ হযরত (সা.) আবুল আসকে এই শর্তে মুক্তি দেন যে, মক্কা যাওয়া মাত্রই সে হযরত যয়নবকে মদিনায় হিজরত করার অনুমতি দিবে। (আসসীরাতুল হালবিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৬৪-২৬৫)

ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন, মুক্তির পর আবুল আস যখন মক্কায় পৌঁছল তখন আঁ হযরত (সা.) যায়েদ বিন হারিসা এবং অপর এক আনসারীকে এই নির্দেশ দিয়ে পাঠালেন যে, তোমরা বাতনে ইয়াজাজ এ অবস্থান কর। (বাতনে ইয়াজাজ মক্কা থেকে ৮ মাইল দূরত্বে অবস্থিত একটি স্থান) যখন যয়নব তোমাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করবে তোমরা তাঁর সঙ্গ নিবে এবং তাকে সঙ্গে করে আমার কাছে নিয়ে আসবে। এই নির্দেশ পেয়ে তাঁরা অবিলম্বে রওনা হন। এই ঘটনাটি বদরের যুদ্ধের এক মাস পরের।

আবুল আস মক্কা পৌঁছে হযরত যয়নবকে আঁ হযরত (সা.)-এর কাছে যাওয়ার অনুমতি দিলে হযরত যয়নব পাথেয় প্রস্তুতির কাজে নিয়োজিত হন। হযরত যয়নব (রা.) বর্ণনা করেন, আমি সফরের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত ছিলাম। এমন সময় হিন্দা বিনতে উতবা আমাকে বলল, মহম্মদ (সা.)-এর কন্যা। আমি জানতে পেরেছি তুমি তোমার পিতার কাছে যেতে চাও। আমি তার কথা কৌশলে এড়িয়ে যাই। একথা শুনে সে বল হে বিনতে উম! এমন ভাব দেখাবে না। যদি সফরের জন্য তোমার কোন সাজসরঞ্জামের প্রয়োজন হয় বা অর্থকড়ির প্রয়োজন হয়, যার সাহায্যে তুমি তোমার পিতার কাছে পৌঁছতে পার, তবে আমার কাছে তোমার প্রয়োজনের সমস্ত উপকরণ মজুদ রয়েছে। আমার সামনে দ্বিধা করো করো না। মেয়েদের মনে সেই ক্ষোভ ও আক্ষেপ থাকে না যা পুরুষদের মনে থাকে। হযরত যয়নব (রা.) বলেন, আমার ধারণা, সে একথা আন্তরিকভাবেই বলেছিল। কিন্তু আমি তার সম্পর্কে ভীত ছিলাম। এই কারণে আমি তাকে বিদায় জানাই। ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন, হযরত যয়নব (রা.) সফরের প্রস্তুতি করেন আর প্রস্তুতি সারা হলে আবুল আস এর ভাই কিনানা বিন রাবী বাহন নিয়ে আসেন। তিনি (রা.) বাহনে সওয়ার হন এবং কিনানা তীর-ধনুক সঙ্গে নিয়ে হযরত যয়নবকে হাউদায় বসিয়ে দিনের আলো থাকতেই রওনা হন। কুরায়েশদের মাঝে যখন বিষয়টি আলোচনায় এল তখন তারা তাদের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল এবং পথ চলতে চলতে 'জি তাওয়া' নামক স্থানে তাদেরকে ধরে ফেলেন। 'জি তাওয়া' মক্কার একটি প্রসিদ্ধ উপত্যকা এবং মসজিদ হারাম থেকে অর্ধ মাইল দূরত্বে অবস্থিত। যাইহোক সবার প্রথমে তাদের পক্ষ থেকে হাব্বার বিন আসওয়াদ ফিহরি এগিয়ে এল। সে বর্শা দিয়ে বাহন দ্রুত হাঁকিয়ে দেয়। হযরত যয়নব সেই সময় অন্তঃসত্তা ছিলেন, তাঁর গর্ভপাত হয়ে যায়। আর তাঁর দেবর তীর বের করে ফেলেন এবং ঘোষণা করেন, যে আমার কাছে ঘেষবে এই তীরের লক্ষ্যে পরিণত হবে। একটি রেওয়াতে একথাও বর্ণিত হয়েছে যে, হাব্বার বাহনে বর্শা ফোটালে হযরত যয়নব (রা.) একটি পাথর খণ্ডের উপর পড়ে যান। আ সেই সময় তিনি অন্তঃসত্তা ছিলেন। এরফলে তাঁর গর্ভপাত হয়ে যায়। যাইহোক এই ঘটনা দেখে লোকে তাদের কাছ থেকে ফিরে আসে। এরপর আবু সুফিয়ান এবং কুরায়েশদের নেতারা সেখানে আসে। তারা তাকে বলে, যুবক, তোমার সঙ্গে কথা বলা শেষ না করা পর্যন্ত তীর নিক্ষেপ করো না। একথা শুনে তীর চালানো থেকে বিরত হয়। আবু সুফিয়ান বলল, তুমি ঠিক করনি। খোলাখুলিভাবে মহিলাকে নিয়ে বের হয়েছ। অথচ তুমি আমাদের জীবনের বিপদ এবং মহম্মদ (সা.)-এর কর্মকাণ্ড সম্পর্কে ভাল করে জান। তুমি যখন মহম্মদ (সা.) এর কন্যাকে প্রকাশ্যে নিয়ে যাবে, তখন লোকে ভাববে এটি আমাদের অপমান ও লাঞ্ছনার কারণ, আমাদের দুর্বলতার পরিচায়ক। আমার নিজের জীবনের কসম! আমাদের একে বাধা দেওয়ার আদৌ কোন প্রয়োজন নেই। এর বিরুদ্ধে কোন ক্ষোভ ও রাগও নেই। কিন্তু ভাল হবে তুমি একে ফিরিয়ে নিয়ে চল। যখন পরিস্থিতির উন্নতি ঘটবে, শান্তি ফিরে আসবে আর লোকেরা মনে করবে যে আমরা তাকে ফিরিয়ে এনেছি, তখন চুপিসারে তাকে তার পিতার কাছে পৌঁছে দিও। এরপর কিনানা এই পরিকল্পনা মেনে চলেন। ইবনে ইসহাকের মতে হযরত যয়ব দু-চার দিন মক্কায় অবস্থান করেছিলেন। এর মধ্যে মানুষের উত্তেজনা প্রশমিত হলে একদিন রাত্রিতে চুপিসারে হযরত যয়নবকে হযরত যায়েদ ও তাঁর সঙ্গীর সোপর্দ করে দেওয়া হয়। তাঁরা হযরত যয়নবকে রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে রাতের অন্ধকারে নিয়ে আসে।

ইমাম বাইহাকি হযরত আয়েশা (রা.)কে উদ্ধৃত করে হযরত যয়নবের মক্কা আগমণের ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, রসুলুল্লাহ্ (সা.) হযরত যায়েদ বিন হারিসাকে নিজের আংটি দিয়ে মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা করেন যাতে তিনি যয়নবকে নিজের সঙ্গে করে নিয়ে আসেন। তিনি নিজের বুদ্ধিমত্তা ও প্রজ্ঞাকে কাজে লাগিয়ে এই আংটি একজন মেষ চারককে দেন, সে সেটি হযরত যয়নবের কাছে সেটি পৌঁছে দেন। হযরত যয়নব আংটি দেখে চিনে ফেলেছিলেন, তাই তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তোমাকে এই আংটি কে দিয়েছে? সে বলল, মক্কার বাইরে থেকে আসা একটি লোক আমাকে এটি দিয়েছে। হযরত যয়নব রাত্রিতে মক্কা থেকে বাইরে আসেন এবং তাঁর পিছনে সওয়ার হয়ে যান এবং তাঁরা তাকে মদীনায় নিয়ে আসেন।

রসুলুল্লাহ্ (সা.) বলতেন, আমার সকল মেয়েদের থেকে যয়নব সর্বোত্তম, কেননা তাকে আমার কারণে কষ্ট পোহাতে হয়েছে।

(আসসীরাতুন নবুয়্যতা লি ইবনে কাসীর, ২য় খণ্ড, পৃ: ৫১৬-৫১৮) (আসসীরাতুন নবুয়্যতা লি ইবনে হিশাম, পৃ: ৪১৫) (ফারহাঙ্গো সীরাত, পৃ: ৫৯,১৮০)

হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম.এ সাহেব সীরাত খাতামান্নাবীঈন পুস্তকে এর বিবরণ দিতে গিয়ে লেখেন- "আঁ হযরত (সা.) আবুল আসের নগদ মুক্তিপণের পরিবর্তে এই শর্ত নির্ধারণ করেন যে, মক্কায় গিয়ে সে যয়নবকে মদিনায় পাঠিয়ে দিবে আর এই ভাবে এক মোমেন আত্মা কুফরের ঘর থেকে মুক্তি পায়। কিছু সময় পর আবুল আসও মুসলমান হয়ে মদিনায় হিজরত করে চলে আসেন। এইরূপে স্বামী-স্ত্রী পুনরায় মিলিত হন। হযরত যয়নবের হিজরতের রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, যখন তিনি মদিনায় আসার জন্য মক্কা থেকে বের হলেন তখন মক্কার কিছু কুরায়েশ তাঁকে জোর করে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাইল। তিনি ফিরে যেতে অস্বীকার করলে হাব্বার আসওয়াদ নামে এক হতভাগা পশুসুলভ ভঙ্গিতে তাঁর উপর বর্শা নিয়ে আক্রমণ করে। এই আক্রমণের অভিঘাত ও সৃষ্ট ভীতির কারণে তাঁর গর্ভপাত হয়ে যায়। এমনক সেই সময় তিনি এমনভাবে আঘাত পান যে, এই ঘটনার পর আর কখনও তাঁর স্বাস্থ্য পূর্বের ন্যায় বহাল হয় নি এবং অবশেষে এই দুর্বলতার অবস্থাতেই ইন্তেকাল করেন।"

(সীরাত খাতামান্নবীঈন, প্রণেতা-হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ, এম.এ, পৃ: ৩৬৮-৩৬৯)

এখন এই পর্যন্তই বর্ণনা করব। বর্তমানে পৃথিবীর যে পরিস্থিতি সে সম্পর্কে এখন একটি দোয়ার বিষেয়েও বলতে চাই। গত কয়েকদিন থেকে হামাস ও ইসরাইলের মাঝে যুদ্ধ চলছে, যার কারণে উভয় পক্ষের সাধারণ নাগরিক, অর্থাৎ মহিলা, শিশু ও বৃদ্ধ নির্বিশেষে মারা নিহত হচ্ছে কিম্বা নিহত হয়েছে।

ইসলাম যুদ্ধ পরিস্থিতিতেও মহিলা ও শিশু এবং সেই সব লোকদের হত্যা করার অনুমতি দেয় না যারা কোনওভাবেই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করছে না। আঁ হযরত (সা.) অত্যন্ত কঠোরভাবে এর নির্দেশও দিয়ে রেখেছেন।

(সুনুন আবু দাউদ, কিতাবুল জিহাদ, হাদীস-২৬১৪)

দুনিয়ার মানুষ বলছে আর সত্য ঘটনাও অনেকটা এমনই যে, হামাস এই যুদ্ধের সূচনা করেছে এবং ইসরাঈলী নাগরিকদের নির্বিচারে হত্যা করেছে। এর পূর্বে ইসরাঈলী সেনা এইভাবে কতই না ফিলিস্তীনী নিপরাধী নাগরিকদের হত্যা করে এসেছে, সে প্রসঙ্গ সরিয়ে আমি বলব মুসলমানদেরকে অবশ্যই ইসলামী শিক্ষা অনুসারে আমল করা উচিত। ইসরাঈলী সেনারা যা করেছে সেটা তাদের কর্ম, এটা সমাধানের অন্য উপায় ছিল।

যদি কোন বৈধ যুদ্ধ হয় তা সেনাদের বিরুদ্ধে অবশ্যই হতে পারে, মহিলা, শিশু ও নিরীহ মানুষদের বিরুদ্ধে নয়। যাইহোক এই দিক থেকে হাসাস যে ভুল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তা অনুচিত ছিল। এর লাভের থেকে লোকসান বেশি। এটা যাই ঘটে থাকুক এর শাস্তি কিম্বা এই যুদ্ধ হামাস পর্যন্ত সীমিত থাকায় উচিত ছিল। বস্তুত প্রতিক্রিয়া ও প্রতিবাদ প্রদর্শনই প্রকৃত বীরত্ব হিসেবে বিবেচিত হত, কিন্তু এখন ইসরাঈল সরকার যা করছে সেটাও

অত্যন্ত ভয়াবহ। মনে হচ্ছে বিষয়টি এখন আর থেমে থাকবে না। কত অগণিত মহিলা ও শিশু আর নিরীহ মানুষের প্রাণহানি ঘটবে তা কেউ কল্পনাও করতে পারবে না। ইসরাঈল সরকার ঘোষণা করেছিল যে, আমরা গাজাকে একেবারে ধ্বংস করে ফেলব। আর এর জন্য তারা অবিরাম যত্রতত্র বোমা বর্ষণ করেছে।শহরে ছাইয়ের স্তুপে পরিণত করেছে। এখন নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। তারা বলছে, ১০ লক্ষের বেশি মানুষ গাজা খালি করুক। এর মধ্যে অনেকে বের হতে শুরু করেছে। তবে আশার বাণী এতটুকুই যে, ক্ষণী কণ্ঠে হলেও ইউএ (জাতিসংঘ)-এর পক্ষ থেকে কিছুটু প্রতিবাদ ধ্বনিত হচ্ছে। তারা বলছে, এটা মানবাধিকার লঙ্ঘন, এটা ভুল পদক্ষেপ হবে আর অনেক সমস্যা তৈরী হবে, তাই ইসরাইল সরকারের উচিত তাদের এই নির্দেশ পুনর্বিবেচনা করা। তাদেরকে দাপটের সাথে কঠোর ভাবে এই অন্যায় পদক্ষেপের নিন্দা না করে এখনও তারা অনুরোধের সুরে আবেদন করে চলেছে।

যাইহোক, সেই সব নিরীহ মানুষদের কোন অপরাধ নেই যারা যুদ্ধ করছে না। বিশ্ববাসী যদি ইসরাইলের মহিলা, শিশু ও সাধারণ নাগরিকদের নিপরাধ মনে করে তবে এই সব ফিলিস্তিনীরাও তো নিরপরাধ। এই আহলে কিতাবদের নিজেদের ধর্ম গ্রন্থও এই শিক্ষা প্রদান করে যে, এভাবে হত্যালীলা চালানো বৈধ নয়। মুসলমানদের উপর এই অপবাদ দেওয়া হয় যে, তারা ভুল করেছে, তবে এরাও আত্মপর্যালোচনা করে দেখুক। যাইহোক আমাদের অনেক বেশি দোয়ার প্রয়োজন।

ফিলিস্তীনের রাষ্ট্রদূত এখানে টিভিতে,সম্ভবত বিবিসিকে, একটি সাক্ষাতকার দেন আর তিনি প্রশ্নকারীর প্রশ্নের উত্তরে বলেন, হামাস হল একটি জঙ্গী সংগঠন, সরকার নয়, ফিলিস্তিন সরকারের সঙ্গে এদের কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি প্রশ্নও তুলেছেন আর তাঁর এই কথার যথার্থতাও রয়েছে যে, যদি সত্যিকার ন্যায় প্রতিষ্ঠিত করা হত তবে এসব কিছুই হত না। যদি পরাশক্তিগুলি নিজেদের দ্বৈতনীতি অনুসরণ না করত বা না করে, তবে পৃথিবীতে এই ধরণের অশান্তি ও যুদ্ধ-বিগ্রহ হতেই পারে না। অতএব, এই দ্বৈতনীতির অবসান ঘটলে স্বাভাবিক নিয়েমে যুদ্ধ-বিগ্রহেরও অবসান ঘটবে। আমি দীর্ঘ সময় যাবত এই কথাগুলিই ইসলামী শিক্ষার আলোকে বলে আসছি। কিন্তু এরা সামনে বলে সব ঠিক আছে, তবে আমল করতে প্রস্তুত নয়।

এখন সমস্ত পরাশক্তিগুলি বা পশ্চিমা শক্তিগুলি ন্যায়নীতিকে একপাশে সরিয়ে রেখে ফিলিস্তিনীদের জব্দ করতে একত্রিত হচ্ছে এবং চতুর্দিক থেকে সৈন্য পাঠানোর কথা উঠছে। অত্যাচারিতদের ছবি দেখানো হচ্ছে যে কিভাবে অত্যাচার করা হচ্ছে। ভ্রান্তিকর প্রতিবেদন তৈরী করে সংবাদ-মাধ্যমগুলিতে পরিবেশিত হচ্ছে। একদিন সংবাদে দেখানো হল যে ইসরাঈলী মহিলা ও শিশুদের কিরূপ ভয়ানক পরিণতি ঘটছে, তাদের অবস্থা অত্যন্ত করুন। পরের দিন জানা গেল, তারা ইসরাঈলী ছিল না, ফিলিস্তিনী ছিল। কিন্তু সংবাদ মাধ্যম মোটেই কোনভাবে ক্ষমা চাইল না, সহানভূতির কোন কথা তাদের মুখ থেকে বের হল না।

জোর যার মুলুক তার- তারা এই নীতি মান্য করে আসছে। যাদের হাতে বিশ্বের অর্থনীতির লাগাম, এরা তাদের সামনেই নতজানু হবে। যদি সমীক্ষা করে দেখা যায় তবে মনে হয় পরাশক্তিগুলি তাদের মধ্যে সৃষ্ট উত্তেজনা প্রশমিত করার পরিবর্তে যুদ্ধ বাধিয়ে দেওয়ার চেষ্টায় মশগুল আছে। এরা যুদ্ধের অবসান চায় না।

প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের পর যুদ্ধের চিরাবসানের জন্য পরাশক্তিগুলি লীগ অফ-নেশনস গঠন করেছিল। কিন্তু ন্যায়ের দাবি তা পূর্ণ করতে পারা এবং নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখতে গিয়ে এটি ব্যর্থ হয় এবং পুনরায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। আর জানা যায়, এই যুদ্ধে দুই কোটিরও বেশি মানুষ নিহত হয়েছিল।

একই অবস্থা এখন জাতিসংঘের। এটি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল পৃথিবীতে ন্যায় প্রতিষ্ঠিত করা এবং অত্যাচারিতদের সঙ্গ দেওয়া এবং যুদ্ধাবসানের জন্য চেষ্টা করা। কিন্তু সেসবই আজ সদূর পরাহত। নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থের দিকেই সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ।

এখন ন্যায় নীতির অভাব ও পক্ষপাতদুষ্টতার কারণে যে যুদ্ধ হবে সাধারণ মানুষের পক্ষে তার ক্ষয়ক্ষতির অনুমান করা মোটেই সম্ভব নয়। পরাশক্তিগুলি সম্যক অবগত যে, কত ভয়াবহ ক্ষতি হবে। কিন্তু তবুও ন্যায় প্রতিষ্ঠার দিকে মোটেই কোন মনোযোগ নেই আর মনোযোগ দেওয়ার জন্যও কেউ প্রস্তুত নয়।

এমন পরিস্থিতিতে মুসলমান দেশগুলির অন্তত ঘুম ভাঙ্গা উচিত। নিজেদের মধ্যেকার মতানৈক্য দূর করে নিজেদের ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করা উচিত। আল্লাহ তা'লা যেখানে মুসলমানদেরকে আহলে কিতাবদের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নত করতে এই নির্দেশ দিয়েছেন تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ (আলে ইমরান:৬৫) (অর্থাৎ তোমরা এমন এক কথায় আস যাহা আমাদের মধ্যে তোমাদের মধ্যে সমান।) তবে মুসলমানরা কেন নিজেদের কলেমা সম্পূর্ণ এক হওয়া সত্ত্বেও নিজেদের মধ্যেকার মতানৈক্য দূর করে ঐক্যবদ্ধ হতে পারে না? অতএব, ভেবে দেখুন আর নিজেদের ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করুন। এটিই বিশ্বের বিশৃঙ্খলা দূর করার মাধ্যম হতে পারে এবং ঐক্যবদ্ধ হয়ে ন্যায়ে দাবি পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে সর্বত্র অত্যচারিতদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার জন্য জোরালো দাবি তুলুন। যদি একতা থাকে, তবে প্রতিবাদের কণ্ঠও জোরালো হবে, অন্যথায় নিরপরাধ মুসলমানদের প্রাণহানির জন্য এরাই দায়ী থাকবে, মুসলমান দেশগুলি দায়ী থাকবে।

আঁ হযরত (সা.) এর নির্দেশ সব সময় দৃষ্টিপটে রাখা উচিত এবং সেই সব শক্তিগুলির কাজ এই নির্দেশকে দৃষ্টিপটে রাখা। নির্দেশটি হল অত্যাচারী এবং অত্যাচারিত উভয়কে সাহায্য কর।

(সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাযালিম, হাদীস-২৪৪৩)

অতএব এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি অনুধাবন করুন। আল্লাহ্ তা'লা মুসলমান দেশগুলিকেও বিবেক ও বুদ্ধি দান করুন। তারা যেন এক হয়ে ন্যায় প্রতিষ্ঠাকারী হয় আর আল্লাহ্ বিশ্বের পরাশক্তিগুলিকেও বিবেক-বুদ্ধি দান করেন, তারা যেন বিশ্বকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়ার পরিবর্তে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে সচেষ্ট হয় এবং নিজেদের অহমিকা ও আমিত্বের বাসনা চরিতার্থ করাকেই নিজেদের উদ্দেশ্য বানিয়ে না ফেলে। তাদের সব সময় স্মরণ রাখা উচিত যে, যখন ধ্বংস নেমে আসবে তখন এই পরাশক্তিগুলিও নিরাপদ থাকবে না। যাইহোক আমাদের কাছে তো দোয়াই একমাত্র অস্ত্র। প্রত্যেক আহমদীকে এই অস্ত্র আগের থেকে বেশি করে ব্যবহার করা উচিত।

গাজায় কিছু আহমদী পরিবারও অবরুদ্ধ হয়ে আছে। আল্লাহ্ তা'লার তাদের নিরাপত্তা বিধান করুন এবং সকল নিরপরাধ ও অত্যাচারিতদের রক্ষা নিরাপদ রাখুন, তারা যেখানেই থাকুক না কেন। আল্লাহ্ তা'লা হামাসকেও বুদ্ধি দিন, এরা যেন নিজেদের লোকদের উপর জুলুম করার জন্য দায়ী না হয় আর অন্য কারো উপরও যেন জুলুম না করে। যুদ্ধ যদি করতেই হয় তবে ইসলামী শিক্ষানুসারে যে নির্দেশ রয়েছে সেই অনুসারে যেন তারা যুদ্ধ করে।

কোন জাতির প্রতি শত্রুতাও যেন আমাদেরকে ন্যায়পরায়ণতা থেকে দূরে না নিয়ে যায়। এটিই আল্লাহ্ তা'লার আদেশ। আল্লাহ্ তা'লা পরাশক্তিগুলিকেও তৌফিক দান করুন, তারা যেন উভয় পক্ষের মধ্যে ন্যায়ের দাবি পূর্ণ করার মাধ্যম শান্তি স্থাপনকারী হয়। তাদের বিচার যেন পক্ষপাতশূন্য হয় এবং কোন পক্ষের অধিকারই যেন খর্ব না হয়। তারা যেন অন্যায়-অত্যাচারের ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন না করে। আল্লাহ্ তা'লা করুন আমরা যেন পৃথিবীতে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রত্যক্ষ করতে পারি।

নামাযের পর দুই ব্যক্তির জানাযাও পড়াব। একটি হাজির জানাযা। জানাযা হাজিরটি হল ডক্টর বশীর আহমদ খান সাহেবের। এখানে যুক্তরাজ্যেই মসজিদ ফযল মহল্লায় থাকতেন। সম্প্রতি তিন ৯২ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন। তিনি ছিলেন হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত মীর আহমদ সাহেব (রা.) এর দৌহিত্র এবং হযরত কাজি মহম্মদ ইউসুফ মহম্মদ সাহেব (রা.) (সাবেক আমীর জামাত, সারহাদ প্রদেশ)-এর জামাতা এবং পেশাওয়ার এর মহম্মদ খোওয়াস খান সাহেবের পুত্র। মরহুম নামায ও রোযার বিষয়ে নিয়মনিষ্ঠ ছিলেন, খিলাফতের প্রতি তাঁর গভীর ভক্তি ও অনুরাগের সম্পর্ক ছিল। তিনি গরিবদের বন্ধু ছিলেন। অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ও পুণ্যবান বুজুর্গ ছিলেন। নুসরাত জাহাঁ স্কীমের অধীনে ওয়াকফ করে তিনি ঘানার টেচিম্যান আহমদীয়া হাসপাতালেও কিছুকাল সেবা প্রদান করেছেন। ঘানা থেকে ফিরে আসার পর তিনি ইসলামাবাদের দেহী এলাকায় আহমদী ডাক্তারদের সঙ্গে মেডিক্যাল ক্যাম্প স্থাপনের তৌফিক লাভ করেন।

যুক্তরাজ্যে স্থানান্তরিত হওয়ার পর হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) -এর যুগেও জুমআর খুতবার অনুবাদ এবং সারাংশ তৈরীর কাজে নিয়োজিত থেকেছেন। কুআন করীমের প্রতি তাঁর গভীর ভালবাসা ছিল। নিয়মিত কুরআন করীম মনোযোগ সহকারে পড়তেন। তাঁর ছেলেমেয়েদেরকেও কুরআনের অনুবাদ শিখিয়েছেন। হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর আশিসময় খিলাফতকালে তিনি কাদিয়ানে গিয়ে শৈশবের এক দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করার সুযোগ পেয়েছেন। হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বহু বক্তব্য তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল। অনুরূপভাবে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পুস্তকের অনেক উদ্ধৃতিও তাঁর মুখস্থ ছিল, নযম মুখস্ত ছিল।

মরহুম মূসী ছিলেন। তিনি স্ত্রী ছাড়াও পিছনে রেখে গেছেন এক পুত্র এবং ছয় কন্যাকে।ডক্টর মুসাল্লাম আদ দারুবী সাহেব তাঁর জামাতা । তাঁর জামাতা বলেন, তিনি নিয়মিত তাহাজ্জুদের নামায পড়তেন। একজন নিষ্পাপ মোমেন ব্যক্তি ছিলেন। মুত্তাকি ও বীর-সাহসী মানুষ ছিলেন। খিলাফত এবং

জামাতের প্রতি তাঁর অসাধারণ ভালবাসা ছিল। আমি তাঁর কাছ থেকে খোলফাদের প্রতি ভালবাসার ন্যায় মূল্যবান শিক্ষা গ্রহণ করেছি। তবলীগের প্রতিও তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। যে কারণে তিনি তবলীগের কোন সুযোগই হাতছাড়া করতেন না। মুসাল্লাম সাহেব বলেন, আমি যখন সিরিয়া ও জর্ডনে ছিলাম, তখন দেখেছি, তিনি যখনই আমার কাছে আসতেন, আমার প্রতিবেশীরা খুব কম সময়ের মধ্যেই তাঁর ভাল বন্ধু হয়ে উঠত। এছাড়াও আমাদের প্রহরী ও অন্যান্য কর্মীদের সঙ্গেও তিনি খুব ভাল সম্পর্ক গড়ে তুলতেন, আর তাদেরকে আহমদীয়াতের বিষয়ে বলতেন।

তাঁর স্ত্রী জুবাইদা সাহেবা বলেন, তৃতীয় খিলাফতের যুগে নুসরাত জাহাঁ স্কীমের অধীনে তাঁকে পশ্চিম আফ্রিকা যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। তিনি পরিপূর্ণ আনুগত্যের সাথে অবিলম্বে যাওয়ার জন্য তৈরী হয়ে যান। এত দ্রুত তৈরী হয়ে যান যে আমিও ভীষন অবাক হয়েছিলাম। আমাদের মেয়ে তখন দুই মাসের, কিন্তু তিনি বললেন, ইমামের হুকুম দ্রুত প্রস্তুত হওয়ার। এরপর আমরা চারজন বাচ্চাকে নিয়ে রাবোয়ায় পৌঁছাই। হুযুর (রাহে.)-এর সঙ্গে সাক্ষাত হয়, দিক-নির্দেশনা গ্রহণ করে বনু ফিরে এসে ছুটির আবেদন জানাই আর সেই সঙ্গে দোয়াও করতে শুরু করি। কেননা,সেই সময় সরকারের পক্ষ থেকে ডাক্তারদের বাইরে যাওয়ার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা ছিল। এটা ছিল ভুট্টু সাহেবের শাসনকাল। কিন্তু যাইহোক তিনি অনুমতি পেয়ে যান আর তিনি চলে যান।

বা-জামাত নামায প্রতিষ্ঠার জন্য যা কিছু সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন, এরজন্য সব সময় দোয়া করতেন যে, কোনভাবে এই সমস্যার সমাধান যেন হয়ে যায়। আর আর আল্লাহ্ তা'লা বার বার তাঁর এই সমস্যার সমাধান করে দিতেন আর তিনি বা-জামাত নামায পড়ার তৌফিক পেতেন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে যখন গাড়ি কেনার তৌফিক দিলেন, তখন মসজিদে আসার এবং মসজিদ থেকে যাওয়ার সময় নিজের বন্ধুদেরকেও সঙ্গে করে নিয়ে আসতেন আর এ বিষয়টি নিয়ে তিনি বেশ আনন্দিত ছিলেন। মসজিদ ফজলের কাছাকাছি ঘর পাওয়ার এই কারণে আনন্দিত হতেন যে তিনি পাঁচ ওয়াক্ত নামায মসজিদে গিয়ে পড়তে পারবেন।

ধর্ম সেবার প্রতিটি উপায় এবং উপকরণ তিনি কাজে লাগাতেন। তবলীগের কোন সুযোগ হাতছাড়া করতেন না। চাঁদা প্রদান যথাসময়ে করতেন আর আমাদেরকেও এর উপদেশ দিতেন। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর প্রতি ক্ষমা ও দয়ার আচরণ করুন। আর তাঁর সন্তানদের মাঝেও তাঁর পুণ্যের ধারা অব্যাহত রাখার তৌফিক দান করুন।

একটি জানাযা গায়েবও রয়েছে। এটি হল মাননীয় ডক্টর শফীক সেহগাল সাহেবের স্ত্রী মাননীয়া ওয়াসীমা বেগম সাহেবার।শফীক সেহগল সাহেব মুলতান জেলার সাবেক আমীর ছিলে। এছাড়া নায়েব উকীলুত তসনীফের পদেও ছিলেন।৮৯ বছর বয়য়ে তিনি ইন্তেকাল করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজেউন। মরহুমা মূসী ছিলেন। স্বামী ছাড়া পিছনে রেখে গেছেন তিন পুত্র। তাঁর স্বামী ডক্টর শফীক সেহগল সাহেব লেখেন, আমার স্ত্রী হযরত মসীহ মওউদ (আ.)এর সাহাবী হযরত শেখ মুশতাক হোসেন সাহেবের পৌত্রী এবং লাহোরের মরহুম জাস্টিস শেখ বশীর আহমদ সাহেবের কন্যা এবং সৈয়্যদা উম্মে ওয়াসীম সাহেবার ভাগ্নী ছিলেন। খিলাফতের প্রত্যেক যুগের সঙ্গে তাঁর গভীর ভালবাসা ও বিশ্বস্ততার সম্পর্ক ছিল।

তাঁর পৌত্র মহীউদ্দীন সাহেব লেখেন, আমার দাদির মাঝে আত্মত্যাগের বিশেষ গুণ ছিল। রূহানী খাযায়েন অনেক বেশি অধ্যায়ন করতেন। আমার দাদা যেহেতু ওয়াকফে জীন্দগী তাই আমি তাঁকে একবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, আপনিও কি ওয়াকফ? তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, ওয়াকফে জিন্দগীদের স্ত্রীরাও ওয়াকফ হয়ে থাকে।

আয়েশা একাধারে তাঁর পুত্রবধু ও ভাতিজী। তিনি বলেন, আমার ফুফু অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। লাজনাদের যে অঙ্গীকার বাক্য পাঠ করানো হয়- আমি আমার প্রাণ, সম্পদ,সময় এবং সন্তানদের উৎসর্গ করার জন্য প্রস্তুত থাকব- তিনি ছিলেন এর ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত। আমার বিয়ের পর তিনি অনেকগুলি তরবীয়তি বিষয় নিয়ে আমার পথপ্রদর্শন করেছেন। আমাকে কুরআন করীমের আভিধানিক অনুবাদও শিখিয়েছেন।

তাঁর ভাগ্নী যাকিয়া সেই সঙেগ তিনি পুত্রবধুও বটে। তিনি বলেন, আমার খালা গরীবদের বন্ধু একজন আদর্শ নারী ছিলেন। সকলের প্রতি স্নেহ করতেন, ভালবাসতেন। স্বামীর কখনও কোন কথা অমান্য করেন নি। এমন কল্যাণকর সত্তা ছিলেন যে তিনি সব সময় মানুষের উপকারের জন্য তৈরী থাকতেন। তাঁর সহোদরা নাঈমা জামীল সাহেবা লেখেন, আমার মায়ের মতই মমতাময়ী ছিলেন। আমি পঞ্চাশ বছর বয়সে বিধবা হলে আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে আমার জন্য ফিরিশতা হিসেবে পাঠান। সব সময় সকল দিক থেকে আমার সাহায্য করেছেন এবং পথপ্রদর্শন করেছেন। তিনি ইবাদতগুজার তো ছিলেনই, সেই সঙ্গে হুকুকুল ইবাদের দায়িত্ব অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন। অনেক মেয়ের বিয়ে তিনি নিজে দায়িত্ব নিয়ে দিয়েছেন। কোন গরিব ও গ্রাম্য ব্যক্তিকেও কখনও নিজের থেকে তুচ্ছ মনে করেন নি। যে সব কর্মীদের অভাব-অনটন নিত্যসঙ্গী, তাদেরকে সাহায্য করার ভরপুর চেষ্টা করতেন।

আল্লাহ্ তা'লা তাঁর প্রতিও ক্ষমা ও দয়ার আচরণ করুন। তাঁর সন্তানদেরকেও তাঁর পুণ্যের ধারা অব্যাহত রাখার তৌফিক দান করুন।

****

সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া কাদিয়ান- এ খিদমতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞপ্তি

২য় শ্রেণীর কর্মী নিয়োগের জন্য শর্তাবলীঃ

(১)প্রত্যাশীর বয়স ১৮ উর্দ্ধ এবং অনুর্দ্ধ ২৫ হওয়া বাঞ্ছনীয়। (২) শিক্ষাগত যোগ্যতা হিসেবে উচ্চ-মাধ্যমিকে কমপক্ষে৪৫% নম্বর নিয়ে উত্তীর্ণ হতে হবে।(৩) উর্দু/ ইংরেজি কমপোজিং এ পারদর্শী হতে হবে। টাইপিং এর গতি মিনিটে ৪৫ শব্দ হওয়া বাঞ্ছনীয়। (৪) এই ঘোষণার ২ মাসের মধ্যে যে আবেদনগুলি আসবে সেগুলিই গণ্য করা হবে।

(৫) নিয়োগ কমিশনের পরীক্ষার পাঠ্যক্রম নিম্নরূপ: (প্রতিটি বিভাগে উত্তীর্ণ হওয়া আবশ্যক।

১ম ভাগ: (৩০ নম্বর) কুআন করীম নাজেরা (দেখাপড়া) এবং ১ম পারার অনুবাদ। * চালিশ জোয়াহের পারে, আরকানে ইসলাম, নামায (সম্পূর্ণ) অনুবাদ।

২য় ভাগ (২০ নম্বর) কিশতিয়ে নূহ, বারকাতুদ দোয়া, দ্বিনী মালুমাত* জামাত আহমদীয়ার আকিদাসমূহ সম্পর্কে প্রবন্ধ* দুররে সামীন থেকে নযম (শানে ইসলাম)।

৩য় ভাগ: (২০ নম্বর) উচ্চমাধিক স্তরের ইংরেজি।

৪র্থ ভাগ (২০ নম্বর) মাধ্যমিক স্তরের গণিত (অফিসের ইম্প্রেস্ট সম্পর্কি প্রশ্ন)

৫ম ভাগ (১০ নম্বর) সাধারণ জ্ঞান।

৬) লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে তবেই ইন্টারভিউ নেওয়া হবে। (৭) লিখিত পরীক্ষা, কম্পিউটার টেস্ট এবং ইন্টারভিউয়ে উত্তীর্ণ হলে প্রত্যাশীকে নূর হাসপাতালে মেডিক্যাল ফিটনেস ও স্বাস্থ্য পরীক্ষায় নিজেকে সুস্থ ও সবল প্রমাণ করতে হবে। (৮) প্রত্যাশীকে কাদিয়ান যাতায়াতের খরচ নিজে বহন করতে হবে। (৯) প্রত্যাশী প্রার্থী নির্বাচিত হলে কাদিয়ানে থাকার ব্যবস্থা নিজেকেই করতে হবে। পরে থাকার বিষয়ে কোন প্রকারের আবেদন গ্রাহ্য করা হবে না।

(নোট: লিখিত পরীক্ষা এবং ইন্টারভিউ -এর দিনক্ষণ জানানো হবে।)

সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া, আঞ্জুমান তাহরীকে জাদীদ, আঞ্জুমান ওয়াকফে জাদীদ কাদিয়ানের প্রতিষ্ঠানগুলিতে মালি/ রাঁধুনি/নানবাঈ/কেয়ারটেকার/চৌকিদার হিসেবে খিদমত করতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞপ্তি।

৪র্থ শ্রেণীর কর্মী নিয়োগের জন্য শর্তাবলী:

(১)প্রত্যাশীর বয়স ১৮ বছরে উর্দ্ধে এবং অনুর্দ্ধ ৪০ হতে হবে। * (২) শিক্ষাগত যোগ্যতার কোন শর্ত নেই, তবে শিক্ষিত প্রত্যাশীদের প্রাধান্য দেওয়া হবে। (৩) জন্ম-তারিখের জন্য স্বীকৃত শংসাপত্রের ফটোকপি দেওয়া আবশ্যক। (৪) ঘোষণার ২ মাসের মধ্যে যে সমস্ত আবেদন পত্র জমা পড়বে সেগুলি বিবেচিত হবে। (৫) কেন্দ্রীয় কর্মী নিয়োগ কমিটি দ্বারা আয়োজিত ইন্টারভিউয়ে উত্তীর্ণ হলে তবেই প্রত্যাশীকে নির্বাচন করা হবে। (৬) ইন্টারভিউ এ উত্তীর্ণ প্রত্যাশীকে নূর হাসপাতালে মেডিক্যাল ফিটনেস পরীক্ষায় নিজেকে সুস্থ ও সবল প্রমাণ করতে হবে। (৭) প্রত্যাশীকে কাদিয়ান যাতায়াতের খরচ নিজে বহন করতে হবে। (৮)প্রত্যাশী নির্বাচিত হলে কাদিয়ানে থাকার ব্যবস্থা নিজেকেই করতে হবে।

(নোট: লিখিত পরীক্ষা এবং ইন্টারভিউ -এর দিনক্ষণ জানানো হবে।)

বিস্তারিত তথ্যের জন্য অফিসে কাজের দিনগুলিতে এই নম্বরে যোগাযোগ করুন। (সময়: সকাল ৮টা থেকে দুপুর ২টা)

Office: 01872-501130,

Mobile: 9682587713, 09682627592

ই-মেল: diwan@qadian.in

জুমআর খুতবা

যুদ্ধ–পরিস্থিতিতে মহানবী (সা.)–এর আদর্শ

মহানবী (সা.)–এর কারো সাথে কোনো ব্যক্তিগত শত্রুতা ছিল না। অর্থাৎ তাঁর হৃদয়ে তাদের জন্য কোনো ব্যক্তিগত শত্রুতার আবেগ ছিল না, বরং এটি আল্লাহ্ তা'লার ধর্মকে ধ্বংসের চেষ্টাকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ছিল, অর্থাৎ যারা খোদার ধর্মকে ধ্বংস করতে চাইত, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ছিল।

আঁ হযরত (সা.) যুদ্ধের নিয়মনীতি নির্ধারণ করেছেন, সন্ধিচুক্তির সম্মান করেছেন আর এগুলোর ওপর যথাসাধ্য আমল করেছেন। বর্তমান যুগের লোকদের ন্যায় নয় যে, নিয়ম কানুন তো অসংখ্যা বানিয়েছে, কিন্তু কোনো আমল নেই, বরং দ্বৈততা রয়েছে।

তাঁর জীবন পবিত্র কুরআনের নির্দেশাবলীর ব্যবহারিক প্রতিফলন ছিল যেখানে ন্যায়বিচার ও শান্তি প্রতিষ্ঠাকে মৌলিক নীতি আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

আঁ হযরত (সা.)–এর আদর্শ এই শিক্ষার আলোকে প্রতিটি আঙ্গিককে পরিবেষ্টনকারী এবং উন্নত প্রতিষ্ঠাকারী ছিল।

উহদের যুদ্ধের কারণসমূহ এবং প্রেক্ষাপট

ঘটনাক্রম থেকে প্রমাণ হয় যে, এই যুদ্ধও শত্রুরা নিজেদের মধ্যে জ্বলতে থাকা শত্রুতার আগুনের কারণে শুরু করেছিল আর বাধ্য হয়ে মুসলমানদেরকেও যুদ্ধে বের হতে হয়।

ফিলিস্তিনের অত্যাচারিতদের জন্য দোয়ার আহ্বান

ফিলিস্তিনিদের জন্য দোয়া অব্যাহত রাখবেন। যুদ্ধবিরতি শেষ হবার পর পুনরায় তাদের ওপর নির্বিচারে বোমাবর্ষণ আরম্ভ হবে আর আবারও বহু নিরীহ লোকেরা শহীদ হবে। কত বেশি অত্যাচার হবে এটা আল্লাহ্ তা'লাই ভাল জানেন। তাদের ভবিষ্যতের বিষয়ে বড় বড় পরাশক্তিগুলোর যে অভিপ্রায়, সেগুলো অত্যন্ত ভয়ানক। তাই তাদের জন্য অনেক দোয়ার প্রয়োজন। আল্লাহ্ তা'লা কৃপা করুন।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে **মুবারকে প্রদত্ত** ১ ডিসেম্বর, , ২০২৩, **এর জুমুআর খুতবা (১ ফতাহ নবুয়ত ১৪০২ হিজরী শামসী)**

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,মহানবী (সা.)–এর যুদ্ধাভিযানসমূহের প্রে ক্ষিতে কিছু কথা বর্ণনা করব।

সেসব পরিস্থিতিতে তাঁর (সা.) ব্যক্তিত্বের বিশেষ দিক এবং তাঁর আদর্শ অসাধারণভাবে আমাদের সামনে ফুটে ওঠে।

বদরের যুদ্ধের বরাতে আমরা দেখেছি যে, কীভাবে তিনি (সা.) বন্দিদের বিভিন্ন সুযোগ–সুবিধা প্রদান করেছেন। বন্দিরা স্বয়ং বলে যে, মহানবী (সা.)–এর এই নির্দেশনা, বন্দিদের সাথে উত্তম আচরণ করো– অনুসারে সাহাবীরা নিজেরা যা খেতেন আমাদেরকে তার চেয়ে উত্তম খাদ্য প্রদান করতেন। এছাড়া আমরা এটিও দেখেছি যে, যখন এসব বন্দিদের মুক্তির বিষয় আসে তখন খুবই সহজ শর্তে তিনি তাদেরকে মুক্ত করে দিয়েছেন। কতিপয় যারা পড়ালেখা জানতো তাদের মুক্তিপণ ছিল কেবল মুসলমানদের লেখাপড়া শিখিয়ে দেওয়া। এর কারণ ছিল কারো সাথে তাঁর (সা.) কোনো ব্যক্তিগত শত্রুতা ছিল না। অর্থাৎ তাঁর হৃদয়ে তাদের জন্য কোনো ব্যক্তিগত শত্রুতার আবেগ ছিল না, বরং এটি আল্লাহ্ তা'লার ধর্মকে ধ্বংসের চেষ্টাকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ছিল, অর্থাৎ যারা খোদার ধর্মকে ধ্বংস করতে চাইত, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ছিল।

এমনও অনেক উদাহরণ রয়েছে যে, কিছু লোক নিজেদের বাধ্যবাধকতার কারণে শত্রুদের পক্ষ হয়ে অংশ নিত। অর্থাৎ তারা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করতে চাইত না, কিন্তু বাধ্য ছিল। তাদেরকে তিনি (সা.) অনেক সুযোগ সুবিধা প্রদান করেছেন। পরবতীতে তাদের মধ্য থেকে অনেকেই মুসলমানও হয়ে যায়।

এছাড়া তিনি (সা.) যুদ্ধের নিয়মনীতি নির্ধারণ করেছেন, সন্ধিচুক্তির সম্মান করেছেন আর এগুলোর ওপর যথাসাধ্য প্রতিষ্ঠিত আমল করেছেন। বর্তমান যুগের লোকদের ন্যায় নয় যে, নিয়ম কানুন তো অসংখ্যা বানিয়েছে, কিন্তু কোনো আমল নেই, বরং দ্বৈততা রয়েছে। তাঁর জীবন পবিত্র কুরআনের নির্দেশাবলীর ব্যবহারিক প্রতিফলন ছিল যেখানে ন্যায়বিচার ও শান্তি প্রতিষ্ঠাকে মৌলিক নীতি আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

যেমনটি এক স্থানে আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۚ اِعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

অর্থাৎ, হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্‌র (সন্তুষ্টির) খাতিরে সাক্ষী হিসেবে ন্যায়ের ওপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হও আর কোন জাতির শত্রুতা তোমাদের যেন আদৌ অন্যায়ে প্ররোচিত না করে। তোমরা ন্যায়বিচার করো, তা তাকওয়ার অধিক নিকটবর্তী আর আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন করো। নিশ্চয় তোমরা যা করো সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ পুরোপুরি অবহিত। (সূরা মায়েদা: ০৯)।

অতএব উক্ত শিক্ষার আলোকে তাঁর (সা.) আদর্শ সকল দিককে পরিবেষ্টনকারী এবং এর উন্নত মান প্রতিষ্ঠাকারী ছিল।

যেমনটি আমি বলেছি, যুদ্ধ সমূহে তাঁর রীতি ও আদর্শ কী ছিল– এ সম্পর্কে বদরের যুদ্ধ ছাড়া অন্যান্য যু দ্ধের বরাতেও বর্ণনা করব। এতে সরায়া অর্থাৎ সেসব যুদ্ধাভিযান যেগুলো তিনি তাঁর জীবদ্দশায় (অন্যদের) রওয়ানা করেছেন আর অন্যদের নেতৃত্বে অন্যদের সেনাপাতি বানিয়ে প্রেরণ করেছেন। যাহোক এটি দীর্ঘ ইতিহাস তাই এতেও হয়ত কিছু খুতবার প্রয়োজন হবে।

আজ উহুদ (এর যুদ্ধ) সম্পর্কে কিছু কথা বর্ণনা করব।

যেমনটি ঘটনাবলি প্রমাণ করে, এই যুদ্ধও শত্রুরা তাদের শত্রুতার আগুনের কারণে আরম্ভ করেছিল আর বাধ্য হয়ে মুসলমানদেরও যুদ্ধের জন্য বের হতে হয়েছে। এর বিস্তারিত বর্ণনায় লেখা আছে যে, এই যুদ্ধ বদরের যুদ্ধের এক বছর পর তৃতীয় হিজরী সনের শাওয়াল মাসে বরোজ শনিবারে সংঘটিত হয়। ঐতিহাসিক এবং জীবনীকাররা এ বিষয়ে একমত যে, উহুদের যুদ্ধ তৃতীয় হিজরীর শওয়াল মাসে সংঘটিত হয়েছিল। অবশ্যএকটি ব্যতিক্রমী বক্তব্য এমনও রয়েছে যে, এই যুদ্ধ চতুর্থ হিজরীতে সংঘটিত হয়েছিল। শওয়াল

মাসের তারিখের সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন মতামত রয়েছে। বেশিরভাগ লোক ৭ এবং ১৫ শওয়ালের উল্লেখ করেছে। ইবনে ইসহাক, ইবনে হিশাম, ইবনে হাযম, ইবনে খাইয়্যাত এবং তাবারী প্রমুখগণ কেবলমাত্র ১৫ শওয়ালের কথা উদ্ধৃত করেছেন।

মহানবী (সা.) মদীনা মুনাওয়ারা থেকে জুমুআর দিন আসরের নামাযের পর যাত্রা করেন এবং শনিবার সূর্য মধ্যাকাশে পৌঁছার পূর্বে উহুদ প্রান্তরে গিয়ে পৌঁছেন। উহুদ পাহাড়গুলোর মধ্যে একটি পাহাড়ের নাম হলো । এটি মদীনা থেকে প্রায় তিন মাইল দূরত্বে অবস্থিত।

[দায়েরায়ে মারেফ সীরাত মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.) ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৪৫৬] (সীরাতুল হালবিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৩২)

উহুদ পাহাড় বর্তমান মসজিদে নববীর প্রায় চার কিলোমিটার উত্তর দিকে অবস্থিত। বলা হয়, বর্তমানে মদীনা মুনাওয়ারার বসতি সেই পাহাড়ের পাদদেশ পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছে, বরং এর চতুর্দিকেও বিস্তৃত রয়েছে। উহুদ পাহাড় হারামের অন্তর্ভুক্ত আর এটি পূর্বপশ্চিমে বিস্তৃত যার দৈর্ঘ ছয় কিলোমিটার এবং এই পাহাড়ের রঙ (অনেকটা) লালচে ধরনের।

[দায়েরায়ে মারেফ সীরাত মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.) ২য় খণ্ড, পৃ: ৩১)

সীরাত খাতামান্ নবীঈন পুস্তকে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) উহুদের যুদ্ধের তারিখ তৃতীয় হিজরীর ১৫ই শওয়াল তথা ৬২৪ খ্রিষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ, রোজ শনিবার (বলে) উল্লেখ করেছেন।

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, প্রণেতা-মির্যা বশীর আহমদ এম.এ, পৃ: ৪৮৭)

এর বিশদ বিবরণ হলো, এ যুদ্ধের কারণ ছিল, বদরের যুদ্ধে কুরাইশরা যখন শোচনীয় পরাজয় বরণ করে তখন কুরাইশের নেতৃস্থানীয় লোকদের মধ্য হতে যেমন, আব্দুল্লাহ্ বিন আবী রবীয়্যা, ইকরামা বিন আবু জাহল, সাফওয়ান বিন উমাইয়্যা, আসওয়াদ বিন মুত্তালিব, জুবায়ের বিন মুতইম, হারেস বিন হিশাম, হুয়াইতাব বিন আব্দুল আযযা এবং কুরাইশের আরো কতক নেতা আবু সুফিয়ানের কাছে আসে; যাদের সেই বাণিজ্যিক কাফেলায় বিনিয়োগ ছিল যা বদরের যুদ্ধের কারণ হয়েছিল। এই বাণিজ্যিক সম্পদ মক্কায় এনে রীতি অনুসারে দ্বারুন নাদওয়াতে রেখে দেওয়া হয় এবং তাদের সম্পদ তাদের কাছে পৌঁছানো হয়নি। কেননা আবু সুফিয়ান যখন এই সম্পদ নিয়ে এসেছিল তখন মক্কার লোকেরা বদরের যুদ্ধের জন্য বেরিয়ে গিয়েছিল। বদরের যুদ্ধের কিছুদিন পর এরা এসে আবু সুফিয়ানকে বলে, মুহাম্মদ (সা.) আমাদের অগণিত লোককে হত্যা করেছে। তাই এই বাণিজ্যিক সম্পদ ব্যয় করে মুহাম্মদ (সা.)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করা উচিত। এতে হয়তো আমরা আমাদের নিহতদের প্রতিশোধ গ্রহণে সক্ষম হবো। তারা আরো বলে, আমরা সানন্দে এ বিষয়ের জন্য প্রস্তুত যে, এই বাণিজ্যিক সম্পদের লভ্যাংশ দ্বারা মুহাম্মদ (সা.)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য একটি সেনাদল প্রস্তুত করা হোক।

একথা শুনে আবু সুফিয়ান বলে, আমি এই প্রস্তাব গ্রহণ করছি আর বনু আব্দে মানাফ আমার সাথে আছে। এরপর কুরাইশরা এ সম্পদ থেকে লভ্যাংশ পৃথক করে যার পরিমাণ ছিল পঞ্চাশ হাজার দিনার এবং মূলধন মালিকদের হাতে তুলে দেয়। আরেকটি উক্তি অনুসারে, যে লভ্যাংশ পৃথক করা হয়েছিল তা ছিল পঁচিশ হাজার দিনার।

(সীরাতুল হালবিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৩৩-১৩৪) (সীরাত এনসাইক্লোপেডিয়া, ৬ষ্ঠ খণ্ড,পৃ: ১৪৫)

যাহোক, যে মুনাফা হয়েছিল তা এ যুদ্ধের জন্য প্রদান করা হয়েছিল। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা এই আয়াত অবতীর্ণ করেন যে,

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ

(সূরা আল্ আনফাল: ৩৭) অর্থাৎ, নিশ্চয় যারা অস্বীকার করেছে তারা আল্লাহ্র পথ থেকে লোকদের বাধা দেওয়ার জন্য নিজেদের ধনসম্পদ ব্যয় করে। যদিও তারা তা (সাধ্যের শেষ সীমা পর্যন্ত) ব্যয় করে যাবে, কিন্তু তা তাদের জন্য (চরম ব্যর্থতার কারণে) আক্ষেপে পর্যবসিত হবে অনন্তর তাদেরকে পরাভূত করা হবে। আর যারা অস্বীকার করেছে তাদের একত্র করে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। (সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৮২)

এই গুরুত্বপূর্ণ কারণটি ছাড়াও আরো কিছু বিষয় ছিল যেগুলোকে এ যুদ্ধের কারণ আখ্যা দেয়া যেতে পারে।

যেমনটি গত খুতবায়ও বর্ণিত হয়েছে যে, বদরের যুদ্ধের পর মক্কাবাসীদের সিরিয়ায় যাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। কেননা মক্কা ও সিরিয়ার বাণিজ্যিক পথ মদীনার উপকণ্ঠ ঘেষে অতিক্রম করত যা মুসলমানদের পক্ষ থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল এবং কাফিরদের পূর্বের অত্যাচার ও নিপীড়নের কারণে তাদের সেদিক দিয়ে কাফেলা নিয়ে যাতায়াত করা দুস্কর হয়ে যাচ্ছিল যে কারণে কুরাইশরা নিজেদের অর্থনৈতিক মৃত্যু দেখতে পাচ্ছিল আর বানিজ্য পথে বাধা, যুদ্ধসমূহ ও অভিযানগুলোতে পরাজয়, বদর প্রান্তরে কুরাইশ সর্দারদের নিহত হওয়া এবং ৭০ জন মুশরিককে বন্দি হওয়ার মতো বিষয়াবলী তাদের সু খ্যাতি ও সামাজিক মর্যাদার ওপর কুৎসিৎ দাগ ছিল যার মোছন এবং সামাজিক খ্যাতি বহাল করার লক্ষ্যে তারা প্রতিশোধ নিতে চাইত যাতে করে মক্কার কুরাইশরদের পতনোম্মুখ রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থান বহাল করা যেতে পারে।

[দায়েরায়ে মারেফ সীরাত মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.) ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৪৩৪]

পক্ষান্তরে বদরের যুদ্ধের পর মক্কার কুরাইশদের আরো দুটি লজ্জাস্কর লাঞ্ছনার শিকার হতে হয় যে কারণে আবু সুফিয়ান-সহ মক্কাবাসীর ক্রোধ ও বিদ্বেষ আরো বেড়ে যায় আর তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য রীতিমত একটি সশস্ত্র যুদ্ধের সংকল্প করে।

যেমন একজন লেখক উহদের যুদ্ধের একটি কারণ এটি বর্ণনা করেন, কুরাইশরা কতক অভিযানে বিফল হয় আর সে কারণে তাদের মাঝে দুঃখক্ষোভ ও প্রতিশোধের আগুন ফুশতে থাকে। আবু সুফিয়ান যে কি-না বদরের প্রান্তরে না নেমেই নিজ বাণিজ্য কাফেলাকে সুরক্ষিত পথ ধরে মক্কায় ফেরত এনেছিল, তাকে মক্কাবাসীদের ক্রমাগতখোঁটাখোঁচার সম্মুখীন হতে হয়। সে মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেবার কসম খায় এবং কুরাইশদের আশ্বস্ত করেছিল যে, সে মদীনায় গিয়ে মুসলমানদের সাথে প্রাণপণ যুদ্ধ করবে। আবু সুফিয়ান নিজের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করার জন্য দু-শো সদস্যের সৈন্যবাহিনীও প্রস্তুত করে এবং মদীনায় পৌঁছেও যায় কিন্তু প্রকাশ্যে যুদ্ধ করার সাহস করতে পারল না বরং মদীনার পাশে কিছু গাছপালা ভূ পাতিত করে, ক্ষেত জ্বালিয়ে এবং দুজনকে হত্যা করে পলায়ন করল।

এ যুদ্ধকে সাভীক-এর যুদ্ধ বলা হয়। এর বর্ণনাও আমি বিগত খুতবাগুলোতে করেছি। আবু সুফিয়ানের উদ্দেশ্য এটা ছিল যেন মক্কাবাসী ভবিষ্যতে তাকে আর এ বলে খোঁটা না দেয় যে, বদর প্রান্তরে তুমি নিজ গোত্রকে রেখে চলে এসেছিলে কিন্তু এই ব্যর্থ অভিযান শেষে লোকেরা আবু সুফিয়ানের এহেন শিশুসুলভ আচরণের কারণে রীতিমত তিরস্কার করতে আরম্ভ করে । যেকারণে আবু সুফিয়ান এখন নিজ অহম চরিতার্থ করার জন্য হলেও মুসলমানদের বিরুদ্ধে একটি বিরাট যুদ্ধের প্রচণ্ড চেষ্টা চালাতে লাগল। বিগত খুতবাগুলোতে যেভাবে কারদা-তে পরাজয়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। মদীনার বিরুদ্ধে আবু সুফিয়ানের ব্যর্থ অভিযান শেষে কুরাইশরা নিজেদের একটি বড়ো বাণিজ্য কাফেলা পথ পরিবর্তন করে ইরাকের রাজপথ ধরে সিরিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিল যেখানে স্বর্ণালংকার, রূপার তৈজসপত্র এবং অন্যান্য ব্যাবসায়িক সামগ্রী যার মূল্যমান আনুমানিক প্রায় এক লক্ষ দিরহাম ছিল। এই কাফেলা যখন কারদা নামক ঝরনায় থামছিল তখন হযরত যায়েদ বিন হারেসা মদীনার সীমার মধ্যে কুরাইশদের কাফেলাকে আটকে দিয়েছিলেন। সমস্ত ব্যাবসায়িক সামগ্রী কুরাইশদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে মদীনায় পৌঁছে ছিলেন। বদরের যুদ্ধে শোচনীয় পরাজয়ের পর কুরাইশদের জন্য কারদা-র ঘটনা অত্যন্ত লজ্জাজনক পরাজয় ছিল। অর্থাৎ তারা তখন মদীনার একেবারে নিকটে ছিল এবং তাদের প্রতিশোধের আগুন দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছিল। উহদের যুদ্ধের কারণসমূহের মাঝে এ ঘটনাটিও একটি ছিল।

(গাযওয়াত ও সারায়া,প্রণেতা-আল্লামা মহম্মদ আজহার ফরীদ, পৃ: ১৫৬-১৫৭)

কাফিরদের যুদ্ধপ্রস্তুতির বহু কারণ ছিল এবং এ জন্য কুরাইশদের পক্ষ থেকে পার্শ্ববর্তী গোত্রসমূহকেও অংশগ্রহণের আহ্বান জানানো হয় যার বিস্তারিত বিবরণ হলো, মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে চূড়ান্ত যুদ্ধের জন্য যখন পুঁজি একত্রিত হয়ে যায় তখন পরবর্তী পদক্ষেপের প্রস্তুতি আরম্ভ হয়। কু রাইশরা ইতোমধ্যে যুদ্ধরত ছিলই কিন্তু তারা আশপাশের বিভিন্ন গোত্রসমূহকে এ যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে। কারো নিকট এককভাবে আবার কারো নিকট দলগতভাবে যায়। কাউকে লোভ দেখায় আবার কাউকে ধর্মীয় এবং আঞ্চলিক আত্মমর্যাদাবোধের কথা বলে সাথে মিলিয়েছে। এ কাজের জন্য আমর বিন আস, হুবায়রা বিন আবি ওয়াহাব, আব্দুল্লাহ্ বিন যিওয়ারা, মুসাফা বিন আবদে মানাফ এবং আবু উযা জাময়ি প্রমুখকে

প্রেরণ করা হয়। এই আবু উযা জাময়ি সেই ব্যক্তি যাকে মহানবী (সা.) বদরের বন্দিদের মধ্য থেকে মুক্ত করেছিলেন। সেসময় সে মহানবী (সা.)-এর নিকট নিবেদন করেছিল যে, হে মুহাম্মদ (সা.)! আমার পাঁচ কন্যা। আমি ছাড়া তাদের আর কেউ নেই। আমাকে ক্ষমা করে দিন। তিনি (সা.) কেবল ক্ষমাই করেন নি বরং কোন মুক্তিপণ ছাড়াই তাকে নিঃশর্ত মুক্তি দেন। এই ছিল তাঁর (সা.) আদর্শ! তখন সে অঙ্গীকার করে যে, ভবিষ্যতে আমি মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না আর তাঁর বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্যও করব না কিন্তু উহদের যুদ্ধে সাফওয়ান বিন উমাইয়ার পক্ষ থেকে পুরস্কার ও সম্মাননার লালসায় সে তার অঙ্গীকার ভঙ্গ করে এবং কাব্য রচনার মাধ্যমে আরববাসীকে উসকে দিতে আরম্ভ করে। এই কবিরা বিভিন্ন গোত্রে গিয়ে গিয়ে তাদেরকে উসকে দিত। অতীত (ঐতিহ্যের) কথা স্মরণ করিয়ে তাদেরকে উসকে দিত এবং তাদের সাথে শরীক হবার আহ্বান জানাতো। কানানা , তা'হামাবাসী ও অন্যান্য গোত্রের অসংখ্য লোক তাদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে এবং মদীনা রাষ্ট্রে রাতে অতর্কিতে আক্রমণ করার সর্বাত্মক নিশ্চয়তা প্রদান করে এবং শুধু তাই নয় বরং তারা অংশগ্রহণও করে।

(কিতাবুল মাগাযি, ১ম খণ্ড, পৃ: ১১০-১১১) [দায়েরায়ে মারেফ, সীরাত মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.) ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৪৩৬]

কাফিরদের এই রণপ্রস্তুতির ব্যাপারে হযরত আব্বাস (রা.)-এর মাধ্যমে মহানবী (সা.) জানতে পারেন যার বিস্তারিত বিবরণ এরূপ: মহানবী (সা.)-এর চাচা হযরত আব্বাস (রা.) কুরাইশদের এসব রণপ্রস্তুতি ও উৎসাহ-উদ্দীপনার সংবাদ প্রেরণ করেন যিনি মক্কায় ছিলেন। হযরত আব্বাস (রা.) বনু গাফফার গোত্রের জনৈক ব্যক্তির মাধ্যমে চিঠি মারফতে এই সংবাদ জানিয়েছিলেন। হযরত আব্বাস (রা.) সেই ব্যক্তিকে চিঠি পৌঁছে দেওয়ার জন্য মজুরির ভিত্তিতে প্রস্তুত করেছিলেন আর তার সাথে এই শর্ত নির্ধারিত হয় যে, তাকে টানা তিন দিন তিন রাত সফর করে মদীনাতে পেঁ ৗছাতে হবে এবং মহানবী (সা.)-কে এই চিঠিটি হস্তান্তর করতে হবে। সুতরাং সে দিনরাত সফর করে এবং ৩য় দিন মহানবী (সা.)-এর সমীপে পৌঁছে যায়। তিনি (সা.) তখন কুবাতে ছিলেন। সেই ব্যক্তি যখন এই চিঠিটি পৌঁছে দেয় তখন তিনি (সা.) এর মোহর খুলেন। অতঃপর তিনি (সা.) উবাঈ বিন কা'ব (রা.)-কে চিঠিটি দিয়ে পড়ে শুনাতে বলেন। উবাঈ বিন কা'ব (রা.) চিঠিটি পড়ে শুনান। তিনি (সা.) তাঁকে (রা.) এই চিঠিটি এবং সংবাদ গোপন রাখতে বলেন। (সীরাতুল হালবিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৯৬)

অন্য একটি রেওয়ায়েত উল্লেখ রয়েছে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) স্বয়ং সা'দ বিন রাবী (রা.)-এর বাড়িতে যান এবং তাঁকে হযরত আব্বাস (রা.) এর পত্র সম্পর্কে অবহিত করেন, আর বলেন আমি আশাকরি মঙ্গল হবে। তুমি সংবাদটি গোপন রেখো। মহানবী (সা.) যখন সা'দ (রা.)-এর বাড়ি গেলে তাঁর স্ত্রী তাঁর কাছে এসে জিজ্ঞেস করেন, মহানবী (সা.) কী বললেন? ঘরের ভেতর থেকে আলোচনা শুনছিলেন। সা'দ বলেন এতে তোমার কি? তিনি বলেন আমি সব কথা শুনেছি । তিনি যখন সমস্ত বৃত্তান্ত শুনালেন তখন সা'দ (রা.) বলেন, ইন্না লিল্লাহ্; আমি বুঝতে পারি নি যে, তুমি আমাদের আলাপ শুনবে। তিনি তাঁর (রা.) স্ত্রীকে মহানবী (সা.)-এর নিকট নিয়ে গেলেন ও তার কথা খুলে বললেন। তিনি বললেন হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আমার শঙ্কা হলো পাছে এই সংবাদ লোকে জানাজানি হয়ে যাবে আর আপনি (হয়ত) ধারণা করবেন যে, মহানবী (সা.) এই গোপনীয়তা রক্ষার নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও আমি তা ফাঁস করেছি। জবাবে মহানবী (সা.) বলেন,ঠিক আছে, এখন এই মহিলাকে ছেড়ে দাও।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৮২-১৮৩)

তাকে সাবধানও করে দিয়ে থাকবেন। একদিকে মহানবী (সা.) তো এই সতর্কতামূলক কৌশল গ্রহণ করেছেন পাশাপাশি অন্যদিকে মদীনার ইহুদী ও মুনাফিকরা এই গুজব ছড়িয়ে দেয় যে, মুহাম্মদ (সা.) কোনো শুভসংবাদ লাভ করে নি। তারা হৃদয়ের নোংরামী প্রকাশ, টিপ্পনী এবং কটুক্তি করার আরো একটি সুযোগ পেয়ে যায়। তারা ঢাকঢোল পিটিয়ে অতিরঞ্জিত করে এই সংবাদ ব্যপকভাবে প্রচার করে আর ইসলামের অনুসারীদেরকে তাদের পক্ষ থেকে ভীতসন্ত্রস্ত করার সর্বাত্মক চেষ্টা করে। অনুরূপভাবে এ সংবাদ মদীনার চতুর্দিকে পার্শ্ববতী এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে এবং সবাই সতর্ক হয়ে যায়। সবদিকে রব পড়ে গিয়েছিল যে, মক্কার মুশরিকরা আবার যুদ্ধের জন্য আসছে।

[দায়েরায়ে মারেফ, সীরাত মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.), ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৪৪৩]

আল্লামা ইবনে আব্দুল বিরের বর্ণনা হচ্ছে হযরত আব্বাস মুশরিকদের সংবাদ লিখে তাঁর (সা.) কাছে প্রেরণ করেছিলেন। মক্কার মুসলমানগণ আব্বাসকে নিজেদের অবলম্বন মনে করতো, কিন্তু আব্বাস মদীনায় মহানবী (সা.)-এর কাছে আসতে চাইতেন। কিন্তু মহানবী (স.) তাকে লিখেন যে, আপনার মক্কায় থাকা অধিক উত্তম। হযরত আব্বাসের প্রেরিত সংবাদ খুব বিস্তারিত হতো। তিনি একটি চিঠিতে লিখেন, কুরাইশবাহিনী আপনাদের দিকে রওনা হয়ে গেছে। তাদের পৌঁছানোর পূর্বেই মোকাবিলার জন্য যথাসম্ভব প্রস্তুতি নিন। এটি মোট তিন হাজার সৈন্যের বাহিনী যাদের সম্মুখভাগে দু -শো অশ্বারোহী ও সাতশো বর্মপরিহিত রয়েছে। তিন হাজার উট রয়েছে এবং তারা সকলপ্রকার অস্ত্রশস্ত্র সঙ্গে আনছে।

(আসসীরাতুন নবুয়্যত, প্রণেতা- মহম্মদ সালাবী, ২য় খণ্ড, পৃ: ৫৬১)

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব সীরাত খাতামান নাবিয়্যিন পুস্তকে হযরত আব্বাসের সংবাদ প্রেরণ সম্পর্কে এভাবে লিখেছেন, বদর যুদ্ধের বিবরণে যে বাণিজ্য কাফেলার উল্লেখিত হয়েছিল সেটির মুনাফার অর্থ যার পরিমাণ ছিল পঞ্চাশ হাজার দিনার, মক্কার নেতাদের সীদ্ধান্ত অনুযায়ী তখনো তা মুসলমানদের বিরুদ্ধে আক্রমণের জন্য দারুন্ নাদওয়ায় গচ্ছিত ছিল। এখন সেই অর্থ বের করা হয় এবং ব্যপক উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি আরম্ভ হয়। তাদের এই প্রস্তুতি সম্পর্কে মুসলমানরা জানতেই পারত না এবং কাফের সৈন্যরা মুসলমানদের দরজায় পৌঁছে যেত। কিন্তু মহানবী (সা.)-এর সজাগ মনমস্তিষ্ক সব জরুরি সতর্কতা অবলম্বন করে রেখেছিল। অর্থাৎ মহানবী (সা.) স্বীয় চাচা আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালেবকে যিনি আত্মিকভাবে তাঁর (সা.) সাথেই ছিলেন, মক্কায় অবস্থানের জন্য তাগিদ করেছিলেন। তিনি কুরাইশদের গতিবিধি সম্পর্কে তাঁকে অবগত করতেন। আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালেব এবারও বনু গাফফারের একজন দ্রুতগামী অশ্বারোহীকে বড়ো পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়ে মদীনার দিকে পাঠিয়ে দেন এবং একটি চিঠির মাধ্যমে মহানবী (সা.)-কে কুরাইশদের এ আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে অবগত করেন এবং সেই সংবাদবাহককে তাকিদ করেন সে যেন তিন দিনের ভেতর তাকে (সা.) এ চিঠি পৌঁছে দেন। যখন এ সংবাদবাহক মদীনায় পৌঁছেন তখন ঘটনাক্রমে মহানবী (সা.) মদীনার পার্শ্ববতী কুবা অর্থাৎ নিকটবতী একটি স্থানে গিয়েছিলেন। সুতরাং সংবাদবাহকও তাঁর পিছনে কুবায় পৌঁছান এবং তাঁর কাছে এ বন্ধ চিঠি পৌঁছে দেন। তিনি (সা.) তখনই তার কাতেব উবাই বিন কাব অনসারীর কাছে চিঠিটি দিয়ে বলেন, এটি পড়ে শুনাও যে, কী লিখা আছে। উবাই চিঠি পড়ে শুনালেন। সেখানে এ ভয়ানক সংবাদ ছিল যে, কুরাইশদের একটি বড়ো সৈন্যবাহিনী মক্কা থেকে আসছে। মহানবী (সা.) চিঠি শুনে উবাই বিন কাবকে বললেন, এটি যেন কারো কাছে প্রকাশ না করে। "

(সীরাত খাতামান্নবীঈন, প্রণেতা-মির্যা বশীর আহমদ এম.এ, পৃ: ৪৮২-৪৮৩)

যাহোক, এ সেনাবাহিনী রওনা হয় এবং এর বিস্তারিত বিবরণ হলো, কুরাইশ বাহিনী শাওয়ালের পাঁচ তারিখে মক্কা থেকে বের হয়।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৮৩)

এ যুদ্ধে কুরাইশের নেতৃত্ব আবু সুফিয়ানের হাতে ছিল। ঘোড়সওয়ারদের অধিনায়ক ছিল খালিদ বিন ওয়ালীদ ও আর পতাকা ছিল বনু আব্দুদ্ দারের হাতে। এছাড়া বর্শ -বলমধারী , যুদ্ধের পোষাক পরিহিত ও ঢাল-তলোয়ার ও তীর-ধনুকে সুসজ্জিত ও প্রতিশোধের স্পৃহা বুকে নিয়ে তিন হাজার যু দ্ধাংদেহী মানুষ মহানবী (সা.)-এর সঙ্গে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে মক্কা থেকে মদীনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে।

তন্মধ্যে দুই হাজার নয়শো কুরাইশ ও তাদের মিত্র এবং অন্যান্য গোত্রের লোক ছিল এবং একশ ছিল কিনানা গোত্রের লোক ছিল। তাদের সাথে ছিল সাতশো বর্ম, দু -শো ঘোড়া এবং তিন হাজার উট যে-রূপ পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। এছাড়া পথে খাবার জন্য জবাই করা নিমিত্তে উটও ছিল। বাজানোর জন্য দাফ এবং পান করার জন্যযথেষ্ট পরিমান মদও সাথে নিয়ে নেয়।

[দায়েরায়ে মারেফ, সীরাত মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.), ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৪৪১)

সীরাতের অপর এক গ্রন্থে লেখা আছে, কুরায়েশ হযরত আব্বাস-কে নিজেদের সাথে উক্ত যুদ্ধে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে কিন্তু আব্বাস অপারগতা প্রকাশ করেন এবং কুরায়েশেরসেই উদাসীনতার উল্লেখ করে যেটি বদরের যুদ্ধে তার প্রতি প্রদর্শন করা হয়েছিল, অর্থাৎ সে গ্রেফতার হয়েছিল কিন্তু কেউ তার মুক্তির বিষয়ে কোনরূপ সাহায্য-সহযোগিতা করে নি। (সীরাতুল হালবিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৯৬)

অনেক মহিলাও প্রতিশোধের স্পীহায় পুরুষের সাথে যুদ্ধে যেতে পীড়াপীড়ি করে। তখন এক ব্যক্তি পরামর্শ সভায় বলে, আমরা

মাথায় কাফনের কাপড় বেঁধে যাচ্ছি। যদি আমাদের নিহত ব্যক্তিদের প্রতিশোধ নিতে না পারি তবে জীবিত ফিরে আসবো না। তাই মহিলাদের সঙ্গ আমাদের জন্য কল্যাণকর সাব্যস্ত হবে। তারা আমাদের মাঝে উত্তেজনা সঞ্চার করবে আর আমাদেরকে বদরের ঘটনা স্মরণ করিয়ে সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার উত্তেজনা সৃষ্টি করবে।

নওফেল বিন মু য়াভিয়া দিলী বলে, মহিলারা আমাদের মান-সম্মান। আমরা যদি পরাজিত হই তাহলে তাদের সম্মানহানীর ফলে আমাদের মর্যাদা ধুলোয় মিশে যাবে। বিভিন্ন রকম প্রস্তাব সামনে আসে। আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দাও তখন সেখানে উপস্থিত ছিল। এই উভয় প্রকারের মতামত যেহেতু পুরুষের পক্ষ থেকে এসে গেছে, সে বলে, হে লোকসকল! তোমরা এ বিষয়টি নিয়ে ভয় পেও না যে, তোমরা বেঁচে ফিরতে পারবে না। তোমরা বদর থেকেও নিরাপদে ফিরে এসেছিলে এবং তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকেও দেখতে পেয়েছিলে। আমাদেরকে এই যুদ্ধে যেতে তোমারা বাধা দিতে পার না। তোমরা বদরে এই ভুলই করেছিলে যখন কিনা তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছিলে। যদি ঐসকল মহিলা বদরের যুদ্ধে তোমাদের সাথে থাকতো তাহলে তোমাদের আত্মাভিমান জাগ্রত করে সম্মুখে প্রেরণ করতো। হায় পরিতাপ! বদরে আমাদের প্রিয়জনরা শত্রুর হাতে নিহত হয়েছে।

[হায়াতে মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.), প্রণেতা-মহম্মদ হোসেন হ্যায়কাল, পৃ: ৩৭৯)

যাহোক, অবশেষে কুরায়েশের সর্দাররা হিন্দার কথায় সহমত পোষণ করে আর তারা তাদের স্ত্রীদেরকে সেনাদলের সাথে নিয়ে যেতে সম্মত হয়। বর্ণনামতে সেনাদলের সহযাত্রী মহিলাদের সংখ্যা ছিল ১৫জন যাদের মাঝে আবু সুফিয়ান নিজ স্ত্রী হিন্দ বিনতে উতবাকে অন্তর্ভুক্ত করে। এমনিভাবে একরামা বিন আবু জাহল নিজ স্ত্রী উম্মে হাকীম বিনতে হারেস বিন হিশামকে সাথে নেয় আর হারেস বিন হিশাম নিজ স্ত্রী ফাতেমা বিনতে ওয়ালিদকে সাথে নেয়। সাফওয়ান বিন উমাইয়্যা নিজ স্ত্রী বারযা বিনতে মাসউদকে সাথে নেয় যে ছিল আব্দুল্লাহ বিন সাফওয়ানের মা। ইবনে ইসহাক বলেন, আমর বিন আস নিজ স্ত্রী রাইতা বিনতে মুনাব্বে'র সাথে যাত্রা করে এবং তালহা বিন আবি তালহা নিজ স্ত্রী সু লাফা বিনতে সা'দকে সাথে নেয়। সে ছিল তালহার সন্তান যথাক্রমে মুসাফী, জালাস এবং কিলাবের মা এবং এরা সকলে উহুদের দিন নিহত হয়। আর বনু মালেক গোত্রের সদস্যা খুন্নাস বিনতে মালেক নিজ পুত্র আবি আযীয বিন উমায়েরের সঙ্গী হয়। তিনি ছিলেন হযরত মুসআব বিন উমায়েরের মা । এছাড়া আমরাহ বিনতে আলকামা যে বনু হারেস গোত্রের সদস্য ছিল সেও সেনাদলের সহযাত্রী হয়।

যুদ্ধ চলাকালীন সময় হিন্দা বিনতে উতবা যখন ওয়াহশীর কাছে আসতো অথবা ওয়াহশী যখন তার কাছে যেত তখন সে তাকে বলত, হে আবু দাসেমা! (এটি ওয়াহশীর উপনাম) এমন কাজ করো যাতে আমাদের হৃদয় প্রশান্ত হয়। ওয়াহশী একজন হাবসী কৃতদাস ছিল, তার কাছে একটি বর্শা ছিল যেটি খুব কমই লক্ষ্যভ্রষ্ট হত এবং যার দেহেই লাগতো তাকে জীবিত ছাড়তো না। ওয়াহশী যুবায়ের বিন মুতঈম-এর কৃতদাস ছিল। সে-ও ওয়াহশীকে ডেকে বলে যে, তুইও সেনাদলের সাথে যা আর তুই যদি হামযা (রা.)-কে শহীদ করতে পারিস (অর্থাৎ হত্যা করতে পারিস) তাহলে তোকে স্বাধীন করে দিব কেননা হামযা আমার চাচা তাঈমা বিন আদীকে হত্যা করেছে।

এই বাহিনী মদীনার বিপরীতে উহুদের ময়দানের সাবখায় কিনাআহ্ উপত্যকার একপ্রান্তে অবস্থিত আইনাইন পাহাড়ে শিবির স্থাপন করে। সাবখাও মদীনায় অবস্থিত আইনাইন নামক পাহাড় এবং জু রফ-এর পাশে একটি জায়গা এবং জুরফও মদীনা থেকে তিন মাইল উত্তরে অবস্থিত একটি জায়গা। আর আইনাইন উহুদের একটি পাহাড়ের নাম। উহুদ এবং এর মাঝে একটি উপত্যকা রয়েছে। কানাআ' মদীনা এবং ওহুদের মাঝে অবস্থিত মদীনার তিনটি প্রসিদ্ধ উপত্যকার মধ্যে একটি উপত্যকা।

(আসসীরাতুন নবুয়্যতা লি ইবনে হিশাম, পৃ: ৫২২) (ফারহাঙ্গো সীরাত, পৃ: ৮৭,১৪৬,২১৬,২৩৯) (সীরাতু হালবিয়া, ২য় খন্ড, পৃ: ২৯৬)

এহলো উহুদের ভৌগোলিক অবস্থান।

যুদ্ধের বিশদ বর্ণনায় আরো লেখা আছে যে, হযরত আব্বাস (রা.) মহানবী (সা.)-কে কুরাইশ সেনাদল সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করেন এবং আমর বিন সালেম মহানবী (সা.)-কে মক্কার মুশরেকদের যাত্রার সংবাদ পৌঁছান। ফলস্রুতিতে আবু সুফিয়ান কিংকর্তব্যবিমুঢ় হয়ে যায়, (মদীনাবাসী সংবাদ পেয়ে গেছে) এটি সে বুঝতে পারে। ঘটনাটি এমন ছিল যে, আমর বিন সালেম (রা.) তার কিছু সঙ্গী-সাথির সাথে যি-ত্বাওয়া থেকে কুরাইশ সেনাদল হতে পৃথক হয়ে অতিদ্রুত মদীনায় পৌঁছান এবং মহানবী (সা.)-কে কাফের সেনাদলের আগমনের সংবাদ দেন। আমর বিন সালেমের এই দল মদীনা থেকে ফিরতি পথে আবওয়া নামক স্থানে রাত্রিবেলা আবু সুফিয়ানের সেনাদলকে অতিক্রম করে সামনে চলে যায় অর্থাৎ, সেস্থানে তাদেরকে অতিক্রম করে। প্রভাতে আবু সুফিয়ান মক্কা অভিমুখে ফিরে যায়। আবু সুফিয়ানকে পথিমধ্যে জানানো হয় যে, আমর বিন সালেম তার কিছু সঙ্গী-সাথি নিয়ে রাতের বেলা মক্কা অভিমুখে বের হয়ে যায়। আবু সুফিয়ান বিচলিত হয়ে বলে, আমি আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলছি, সে অবশ্যই মুহাম্মদ (সা.)-এর কাছে গিয়ে তাঁকে আমাদের অভিযান সম্পর্কে সংবাদ দিয়ে এসেছে। তাঁকে [অর্থাৎ, মহানবী (সা.)-কে] আমাদের সকল তথ্য সরবরাহ করেছে, এবং তাঁকে সতর্ক করে দিয়েছে। এখন আমাদের পৌঁছানোর পূর্বেই মুসলমানরা নিজেদেরকে দুর্গে সুরক্ষিত করে নেবে। এমনটি হলে আমরা তো তাদের কোন ক্ষতি সাধন করতে পারব না আর আমরা আমাদের উদ্দেশ্যে সফলও হব না। সাফওয়ান বিন উমাইয়্যা তৎক্ষনাৎ বলে ওঠে যে, তারা যদি দুর্গ থেকে বের হয়ে খোলা প্রান্তরে আমাদের সাথে যুদ্ধ করতে না-ও আসে তাহলেও দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই, আমরা অওস এবং খাজরাজের খেজুর বাগান কর্তন করব যার ক্ষতি তারা কখনোই কাটিয়ে উঠতে পারবে না এবং নিজেদের ধন-সম্পদ ও শস্যাদি খুইয়ে রিক্তহস্ত হবে। আর তারা যদি দুর্গ থেকে বের হয়ে মরুপ্রান্তরে যুদ্ধ করতে আসে তবুও বিচলিত হওয়ার কিছু নেই, কেননা আমাদের সংখ্যা তাদের তুলনায় কয়েক গুণ বেশি। আমাদের সমরাস্ত্রের সাথেও তাদের সমরাস্ত্রের কোন তুলনাই চলে না। তাদের কাছে কোন ঘোড়া নেই আমাদের কাছে অনেকগুলো ঘোড়া আছে। আমরা যুদ্ধে তাদের জীবন ও সম্পদের ক্ষতি করতে সামর্থ্য রাখি পক্ষান্তরে তারা আমাদের সাথে মোটেই লড়াই করার ক্ষমতা রাখে না।

[দায়েরায়ে মারেফ, সীরাত মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.), ৬ষ্ঠ খন্ড,পৃ: ৪৪৩-৪৪৪]

এভাবে সে নিজ অভিমত প্রকাশ করে।যাহোক, মদীনা অভিমুখে অগ্রযাত্রা অব্যাহত রেখে কুরাইশরা যখন আবওয়া নামক স্থানে পৌঁছে শিবির স্থাপন করে তখন হিন্দা বিনতে উতবা আবু সুফিয়ানকে বলে, তোমরা মুহাম্মদ (সা.)-এর মায়ের কবর উপড়ে ফেল কেননা তাঁর কবর আবওয়াতে আছে। তারা যদি তোমাদের কোন ব্যক্তিকে আটক করে তবে তোমরা প্রত্যেক সদস্যের মুক্তিপণ হিসেবে তাঁর মায়ের একেকটি অঙ্গ দিয়ে দিবে। [অদ্ভুত শয়তানী পরামর্শ ছিল।]আবু সুফিয়ান একথা কুরাইশদের কাছে উল্লেখ করে বলে, এটি একটি পরামর্শ। তখন কুরাইশরা জবাবে বলে, তোমরা এই দ্বার উন্মুক্ত করো না নতুবা বনু বকর আমাদের মৃতদের কবর উপড়ে ফেলবে। (সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৮৩)

এটি বড়ই ভয়ানক পরামর্শ এটি গ্রহণ করো না। যাহোক, এরা পথিমধ্যে যেখানেই শিবির স্থাপন করত, সেখানেই উট জবাই করা হতো। নারীরা কবিতা পাঠ করে লোকদের যারপরনাই উত্তেজিত করত, মদে পূর্ণ পানপাত্র পরিবেশন করত, শোকগাঁথা পাঠ করে নিজেরাও আর্তনাদ করত আর অন্যদের কাদাতো এবং প্রতিশোধের স্পৃহা জাগ্রত করত।

[দায়েরায়ে মারেফ, সীরাত মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.), ৬ষ্ঠ খন্ড,পৃ: ৪৪১]

কাফেরদের এই কাফেলা এভাবেই অগ্রসর হতে থাকে আর অপরদিকে মুসলমানরাও নিজেদের মত করে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে। এ সম্পর্কে লেখা আছে, শাওয়াল মাসের প্রথম দশকের বৃহস্পতিবার রাতে মহানবী (সা.) ফাযালা'র পুত্রদ্বয় আনাস ও মোনেসকে গোয়েন্দাতথ্য সংগ্রহের জন্য প্রেরণ করেন।

(সুবুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৮৩)

সম্ভবত এ সময়েই তিনি মুসলমানদের সংখ্যা এবং সক্ষমতা যাচাই করার জন্য তিনি (সা.) এই নির্দেশও প্রদান করেছিলেন যে, মদীনার সকল মুসলমান বসতির আদমশুমারি করা হোক। অতএব, আদমশুমারি করা হলে জানা যায় যে, তখন পর্যন্ত সর্বমোট পনেরশ জন মুসলমান রয়েছে। তৎকালীন অবস্থার নিরীখে সেটিকে অনেক বড় সংখ্যা মনে করা হয়েছিল। সুতরাং কতিপয় সাহাবা (রা.) আনন্দের আতিশয্যে এ কথা পর্যন্ত বলেছিলেন যে, এখন আমাদের কি কোন ভয় থাকতে পারে যখন কি-না আমাদের সংখ্যা দেড় হাজারের উপনিত হয়েছে? কিন্তু তাদের মধ্যে হতে এক সাহাবী বলেন, পরবতীতে আমাদের ওপর এত কঠিন সময় আসে যে, কখনও কখনও

আমাদেরকে লুকিয়ে পর্যন্ত নামায আদায় করতে হতো। এর পূর্বেও মহানবী (সা.) কোন এক সময়ে আদম শুমারী করিয়েছিলেন তখন মুসলমানদের সংখ্যা ছয় বা সাতশর মত ছিল। ”

(সীরাত খাতামান্নবীঈন, প্রণেতা-মির্যা বশীর আহমদ, এম.এ, পৃ: ৪৮৩)

যাহোক, মহানবী (সা.) যে দু'জন সাহাবীকে খোঁজখবর নেওয়ার জন্য প্রেরণ করেছিলেন তারা আকীক নামক স্থানে গিয়ে কুরায়শদের সাথে ধরে ফেলে এরপর তারা মহানবী (সা.) এর কাছে ফিরে আসেন এবং তাঁকে কুরা্ইশ সৈন্যবাহিনী সম্পর্কে অবগত করেন। আরব উপদ্বীপে আকীক নামে অনেকগুলো উপত্যকা রয়েছে আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপত্যকা হলো আকীক যা মদীনার দক্ষিন-পশ্চিম হতে উত্তর পূর্ব পর্যন্ত বিস্তৃত আর এতে মদীনার সমস্ত উপত্যকা এসে একীভূত হয়। (ফারহাঙ্গো সীরাত, পৃ: ২০৪)

যাহোক তারা উভয়ে এসে বলল, কাফের সৈন্যবাহিনী তাদের উট এবং ঘোড়া উরায়েয নামক স্থানের ক্ষেতে ছেড়ে রেখেছে। উরায়েয মদীনা হতে তিন মাইল দূরত্বে অবস্থিত একটি খেজুরের বাগান।

(সীরাত এনসাইক্লোপেডিয়া, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৬৫-৬৬)

সেগুলো কোন ঘাস ও গাছপালা অবশিষ্ট রাখে নি, সবই খেয়ে ফেলেছে। মুশরিকরা বুধবারে কেনাআ উপত্যকায় এসে উপণীত হয়। বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার উক্ত উপত্যকায় তাদের উট ঘাস লতা-পাতা খেতে থাকে। তারাও কোন ঘাস লতা-পাতা অবশিষ্ট রাখে নি। অতপর মহানবী (সা.) হুব্বাব বিন মুনযেরকে তাদের প্রতি প্রেরণ করেন। তিনি তাদেরকে দেখে ফিরে আসেন আর তাদের সংখ্যা ও সাজ সরঞ্জামের ধারণ উপস্থাপন করেন। তখন মহানবী(সা.) বলেন, তুমি তাদের কথা কাউকে বলবে না। হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওকীল্ আল্লাহুম্মা বিকা আজুলু ওয়া বিকা আসুলু। অর্থাৎ আল্লাহ্ আমাদের জন্য যথেষ্ট আর তিনি উত্তম অভিভাবক। হে আল্লাহ! আমি তোমার সাহায্যে প্রদক্ষিন করি এবং তোমার সাহায্যেই আক্রমন করি। আর আওস ও খাযরাজের সর্দার হযরত সা'দ বিন মাআয, হযরত উসায়েদ বিন উযায়ের এবং হযরত সা'দ বিন উবাদা মুশরিকদের আক্রমনের আশঙ্কায় জুমআর রাতে সমরাস্ত্রে সজ্জিত হয়ে মসজিদে মহানবী (সা.) এর দরজায় রাত অতিবাহিত করেনআর সকাল পর্যন্ত মদীনায় পাহারা দেন।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৮৩-১৮৪) (সীরাতুল হালবিয়া, ২য় খণ্ড,পৃ: ২৯৭)

মক্কার মুশরিক সৈন্যবাহিনী মুসলমানদের মদীনা থেকে বের হওয়ার পূর্বেই কেনাআ উপত্যকার লবনাক্ত এবং চোরাবালিবহুল ভূমিতে এসে শিবির স্থাপন করে।

(গাযওয়ায়ে উহুদ, প্রণেতা-মহম্মদ আহমদ বামিমিল, পৃ: ৯৭)

মদীনার পূর্ব, পশ্চিম এবং দক্ষিনে খেজুরের ঘন বাগান ছিল। সেগুলো অতিক্রম করে কোন গ্রাম বা জনবসতিতে আক্রমন করা সহজ বিষয় ছিল না। কেননা বাগানে শত্রুপক্ষের শুধুমাত্র একজন ব্যাক্তি অনেক কষ্টে অগ্রসর হতে পারত। এমন পরিস্থিতিতে আক্রমনকারী অতি সহজেই মারা পড়ার সম্ভাবনা ছিল। শুধুমাত্র উত্তর দিক দিয়ে আক্রমন সম্ভব ছিল। এ কারণে কুরাইশরা উত্তর ও পশ্চিম প্রান্তে অবস্থান নেয়। এছাড়া সমগ্র জনবসতি এক স্থানে ছিল না, বরং পাহাড়ের মধ্যে বিস্তৃত ভূমিতে বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন অবস্থায় বহু বসতি বা মহল্লা হিসেবে ছিল। কিছু গোত্র নিজেদের ভূমিতে এবং বাগানসমূহের কাছে বসবাসের ব্যবস্থা করে নিয়েছিল এবং কয়েকটি দ্বিতল অস্থায়ীবাসা নির্মাণ করেছিল। তারা যে কোন বিপদের সময় শিশু এবং নারীদের উক্ত ঘরের উপরের তলায় উঠিয়ে দিত এবং নিজেরা দায়িত্ব মুক্ত হয়ে আক্রমণকারীদের প্রতিহত করত।

(গাযওয়াতুন নবী, প্রণেতা-মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, পৃ: ৬৩-৬৪)

আরেকজন জীবনীকার লিখেছেন, শত্রুদের সৈন্যবাহিনী মুসলমানদের সেনাবাহিনী এবং মদীনার মুনাফিক, ইহুদি এবং যুদ্ধে অপারগ মুসলমান নারী এবং শিশু ছাড়া কেউ অবশিষ্ট ছিল না, তাদের মাঝে সকল পর্যন্ত বাধা সৃষ্টি করতে থাকে।

(গাযওয়ায়ে উহুদ, প্রণেতা-মহম্মদ আহমদ বামিমিল, পৃ: ৯৯)

হযরত মির্যা বশীর আহমদ (রা.) এর বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরে লেখেন, সম্ভবত তৃতীয় হিজরীর শেষে কিংবা রমযানের শুরুতে কুরাইশ সৈন্যবাহিনী মক্কা থেকে যাত্রা করে। সৈন্যবাহিনীতে অন্যান্য আরব গোত্রের অনেক সাহসী যোদ্ধাও অংশগ্রহণ করেছিল। আবু সুফিয়ান সেনাবাহিনীর নেতা ছিল। সেনাবাহিনীর সদস্যসংখ্যা ৩০০০ ছিল যেখানে ৭০০ বর্ম পরিহিত অন্তর্ভুক্ত ছিল। বাহনও যথেষ্ট ছিল। অর্থাৎ দুইশ ঘোড়া ও তিন হাজার উট ছিল। পর্যাপ্ত পরিমাণে সমরাস্ত্র ছিল। নারীরাও সাথে ছিল। আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা এবং ইকরামা বিন আবু জাহল, সাফওয়ান বিন উমাইয়্যা, খালেদ বিন ওয়ালিদ এবং অন্যান্য লোকদের স্ত্রীরাও ছিল। এসব নারী আরবের প্রাচীণ প্রথা অনুযায়ী বাদ্যযন্ত্র নিজেদের সাথে নিয়ে এসেছিল যেন উত্তেজক কবিতা পাঠ করে এবং দাফ (বাদ্যযন্ত্র) বাজিয়ে নিজেদের পুরুষদের উত্তেজিত করতে থাকে। কুরায়েশের এই দলটি দশ এগারো দিনের সফর করার পরে মদীনার নিকটে পৌঁছায় এবং চক্রাকারে প্রদক্ষিণ করে মদীনার উত্তরদিকে উহুদ পাহাড়ের পাশে অবস্থান নেয়। এই স্থানের নিকটেই সবুজ শ্যামল 'উরায়েয' মাঠ অবস্থিত যেখানে মদীনার গবাদি পশু চরে বেড়াতো আর কিছু ক্ষেত খামারও ছিল। কুরায়েশরা সর্বপ্রথম এই চারণভূমিতে আক্রমণ করে এতে ইচ্ছেমতো লুটতরাজ চালায়। যখন মহানবী (সা.) নিজের বার্তাবাহকদের মাধ্যমে সৈন্যদলের নিকটবর্তী হওয়ার সংবাদ পেলেন তখন তিনি (সা.) নিজের একজন সাহাবী হুব্বাব বিন মুনযের (রা.) কে শত্রুদের সংখ্যা ইত্যাদির সংবাদ সংগ্রহের জন্য প্রেরণ করেন। একইসাথে বলে দেন, যদি শত্রুদের সংখ্যা বেশি হয় এবং মুসলমানদের জন্য আশংকাজনক হয় তাহলে যেভাবে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে তিনি (সা.) বলেন, প্রকাশ্যে উল্লেখ না করে গোপনে আমাকে অবহিত করবে যেন মুসলমানদের মনোবলে চিড় না ধরে। যাহোক হুব্বাব গোপন পথে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে যান স্বল্প সময়ের মাঝে ফেরত এসে মহানবী (সা.) কে পুরো বিষয়টি অবহিত করলেন। তখন সেনাদলের আগমনের সংবাদ মদীনাতে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং 'উরায়েয' বাগানে তাদের আক্রমণের সংবাদ জনসাধারণের মাঝে ছড়িয়ে পড়েছিল। যদিও সাধারণকে কাফের সেনাদলের বিস্তারিত বিবরণ জানানো হয় নি, তাত্ত্বেও সেই রাত মদীনাতে প্রচন্ড ভয় এবং আশঙ্কায় পার হল। নির্বাচিত সাহাবীরা সারারাত মহানবী (সা.) এর বাড়ির আশেপাশে পাহারা দেন।

(সীরাত খাতামান্নবীঈন, প্রণেতা-হযরত মির্যা বশীর আহমদ, এম.এ, পৃ: ৪৮৩-৪৮৪)

যখন উহুদের যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য পরামর্শ হল সে সময়েই রসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, রাতে আমি একটি স্বপ্নে দেখেছি যে একটি গাভী জবাই করা হচ্ছে এবং আমার তরবারি যুলফিকার এর ফলা ভেঙ্গে যেতে দেখেছি। একটি রেওয়াতে এই শব্দ রয়েছে যে আমার তরবারির হাতল ভেঙ্গে গেছে। একটি রেওয়াতে এভাবে রয়েছে, আমি দেখলাম আমার তরবারি 'যুলফিকার' এর হাতলের কাছে ফাটল ধরেছে। এই উভয় বিষয় কোন বিপদের দিকে ইঙ্গিত করছে। এরপর আমি (মহানবী সা.) দেখলাম, আমি একটি শক্তিশালী বর্মে হাত প্রবেশ করাচ্ছি। একটি রেওয়াতে এভাবে এসেছে, আমি একটি শক্তিশালী বর্ম পরিধান করে আছি আর আমি একটিভেড়ার ওপর আরোহন করে আছি। সাহাবাগণ মহানবী (সা.) কে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি এর কী ব্যাখ্যা করেছেন? তিনি (সা.) বললেন, গাভী জবাইয়ের অর্থ হলো আমার কিছু সাহাবী শহীদ হবে। একটি রেওয়াতে এমনভাবে বর্ণিত হয়েছে, জবাইকৃত গরু দ্বারা এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করেছি, আমাদের মাঝ থেকে কিছু শহীদ হবে। আমার তরবারির ফাটলের অর্থ হলো আমার পরিবার বা বংশের কোন ব্যক্তি নিহত হবে। একটি রেওয়াতে এই শব্দটি রয়েছে যে, আমার তরবারির ফলায় ফাটলের অর্থ হলো এই ক্ষতি তোমাদের কারো হবে না অর্থাৎ বংশের বাইরের কারো হবে না। এখানে 'ফুলুল' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে যার অর্থ হলো তরবারির ভোঁতা হয়ে হয়ে যাওয়া বা তরবারির হাতলে ছিদ্র হয়ে যাওয়া বা ভেঙ্গে যাওয়া। এটি এই বিষয়ের ইঙ্গিত বহন করে যে, দুটি দুর্ঘটনা ঘটবে। শক্তিশালী বর্মের অর্থ হল মদীনা। ভেড়ার অর্থ হলো আমি শত্রুদের সহযোগীদের হত্যা করবো।

যাহোক মহানবী (সা.) এই বিষয়ে পরামর্শ আহ্বান করেন। ইবনে উতবা, ইবনে ইসহাক এবং ইবনে সা'দ প্রভৃতি বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সা.) এই স্বপ্ন বৃহস্পতিবার রাতে দেখেছেন। যখন ভোর হল তখন তিনি সাহাবাগণের নিকট উপস্থিত হলেন। আল্লাহ তা'লারগুণকীর্তন করার পর নিজের স্বপ্ন বর্ণনা করেন। এরপর বলেন, যদি তোমরা সম্মত হও তাহলে আমরা মদিনাতে অবস্থান করবো আর নারী ও শিশুদেরকে দূর্গে পৌঁছে দেওয়া হবে। যদি তারা শহরের বাইরে অবস্থান করেতাহলে সেটি হবে মন্দ স্থান। আর যদি তারা আমাদের শহরে প্রবেশ করে তাহলে আমরা গলিতে তাদের মোকাবেলা করবো। আর আমরা এসব পথ তাদের থেকে ভালো চিনি। এছাড়া টিলার উপর থেকে তাদের ওপর পাথরও নিক্ষেপ করা যাবে। তারা অবকাঠামোগত দিক দিয়ে মদিনাকে সুরক্ষিত করেছিল। মদিনা একটি দূর্গের ন্যায় ছিল। মহানবী (সা.) এর মতামতের সাথে

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023 -2025 Vol-9 Thursday, 18 Jan, 2024 Issue No.9

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

প্রবীণ মুহাজের ও আনসারী সাহাবারা একমত ছিলেন। এছাড়া আবদুল্লাহ বিন উবাইও একই মতামত প্রকাশ করেছিল। তবে মুসলমানদের মাঝে একটি দল যাদের মাঝে অধিকাংশ যুবক সাহাবী ছিলেন আর এরা বদরের যুদ্ধে অংশ নিতে পারেনি, অধিকন্তু তারা শাহাদাতের আকাঙ্খা রাখতেন এবং শত্রুর সাথে লড়াইয়ের বাসনা রাখতেন। তারা বললেন, হে আল্লাহর রসূল (সা.)! আপনি আমাদেরকে মদিনার বাহিরে শত্রুদের সম্মুখে নিয়ে চলুন। তারা যেন আমাদের কাপুরুষ মনে না করে। আবদুল্লাহ বিন উবাই বললো, হে আল্লাহর রসূল! মদিনাতেই অবস্থান করুন, মদীনা থেকে বাহিরে বের হবেন না। আল্লাহর কসম! আমরা যখনই মদিনার বাহিরে শত্রুর মোকাবেলা করেছি, আমরা পরাজিত হয়েছি আর যখনই কেউ মদিনা লড়তে এসেছে আমরা বিজয়ী হয়েছি।

(সীরাতুল হালবিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৯৭-২৯৮) (সুবুলুল হুদা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৮৫)

হামজা বিন আব্দুল মুত্তালিব (রা.), সাদ বিন উবাদা (রা.) এবং নু'মান বিন মালিক (রা.) বলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমাদের আশঙ্কা হলো, যদি আমরা মদিনা থেকে বাইরে বের না হই তাহলে শত্রু ভাববে আমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করতে ভয় পাচ্ছি আর এ কারণে আমরা বাইরে বের হই নি। ফলে আমাদের বিরুদ্ধে তাদের সাহস বেড়ে যাবে। এছাড়া বদরে আপনার সাথে যখন কেবল তিনশত সদস্য ছিল তখনই আল্লাহ আপনাকে বিজয়ী করেছেন। আর আজ তো আমরা আরো অধিক সংখ্যায় আছি।

ইয়াস বিন অওস বিন আতিক বলেন, স্বপ্নে দেখা জবাইকৃত গাভী হওয়ার প্রত্যাশা ব্যাক্ত করে বনু আবদুল আশআল । অর্থাৎ স্বপ্নে যে গাভী জবাই হতে দেখা গেছে তারা বলল, আমরা আশা রাখি এই গাভী আমরা হবো। তারা ব্যতিত অন্যরা বলল, এটি দুটি কল্যাণের মাঝে একটি; হয় বিজয় নয়তো শাহাদাত। খোদার কসম! আরবরা যেন আমাদের ঘরে প্রবেশ করার মতো স্বপ্ন না দেখে। হযরত হামজা বলেন, সেই সত্তার কসম যিনি আপনার ওপর মহান কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, আজকে আমি খাবার খাবো না যতক্ষণ পর্যন্ত মদিনার বাহিরে গিয়ে নিজ তরবারি দ্বারা আমি তাদের মোকাবেলা না করবো। অতএব তিনি শুক্রবার ও শনিবার রোজা রাখেন। আর যখন তিনি শহীদ হন তিনি ছিলেন রোযাদার।

(কিতাবুল মাগাযি লিল ওয়াকিদি, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৯৪)

নু'মান বিন মালিক (রা.) বলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমাদেরকে জান্নাত থেকে বঞ্চিত করবেন না। সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ, আমি অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবো। তখন মহানবী (সা.) জিজ্ঞেস করেন, কিভাবে? তিনি জবাব দেন- কারণ আমি আল্লাহ্ তা'লা ও তাঁর রসূল (সা.) কে ভালোবাসি। অন্য এক রেওয়ায়েতে রয়েছে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কোন উপাস্য নেই এবং নিঃসন্দেহে মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ্র রসূল আর আমি যুদ্ধের দিন পালাবো না। তখন মহানবী (সা.) বলেন, তুমি সত্য বলেছো। তিনি এই যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন। মালিক বিন সিনান খুদরী এবং আইয়াস বিন আতিকসহ একটি দল যুদ্ধের যাওয়ার জন্য অনেক প্রেরণা জোগান। (সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৮৬)

হযরত মির্যা বশির আহমদ সাহেব (রা.) এই ঘটনার বিস্তারিত 'সীরাতে খাতামান্নাবিঈন' পুস্তকে এভাবে লিখেছেন মহানবী (সা.) মুসলমানদের একত্রিত করে কুরাইশের আক্রমণের প্রেক্ষিতে মদিনায় থাকা উচিত নাকি বাইরে বের হয়ে লড়াই করা উচিত সে বিষয়ে পরামর্শ চান। পরামর্শের পূর্বে মহানবী (সা.) কুরাইশের আক্রমণ এবং তাদের হিংস্র অভিসন্ধিক কথা উল্লেখ করে বলেন, আজ রাতে আমি স্ব প্ন দেখেছি, এরপর তিনি সে স্বপ্ন বলেন যার উল্লেখ এখনই করা হলো। সাহাবারা স্বপ্নের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করলে তিনি (সা.) বলেন, গাভী জবাই করা বলতে আমি বুঝি- আমার কতিপয় সাহাবীর শহীদ হওয়া। আর আমার তরবারির ফলা ভেঙ্গে যাওয়া আমার কোন নিকটাত্মীয়ের শাহাদাতের দিকে ইঙ্গিত বলে মনে হচ্ছে। হয়তোবা এই অভিযানে আমি স্বয়ং কোন ক্ষতির সম্মু খীন হব। আর বর্মের ভেতর হাত ঢুকানোর অর্থ হলে আমি মনে করি এই আক্রমণ প্রতিরোধের লক্ষে আমাদের মদীনার ভেতরে অবস্থান করা অধিক সমীচিন হবে। আর ভেড়ায় আরোহন করার যে স্বপ্নটি, সেটির তিনি (সা.) এই তা'বীর করেন যে এর অর্থ কাফেরদের সেনাদলের নেতা অর্থাৎ পতাকাবাহীকে বুঝানো হয়েছে, যে ইনশাল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদের হাতে নিহত হবে। এরপর তিনি (সা.) সাহাবাদের নিকট পরামর্শ চান যে বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে কি করা উচিত? আর যেভাবে পূর্বে উল্লেখ হয়েছে, সাহাবীগণ মহানবী (সা.)-এর স্বপ্ন দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অথবা তখনকার অবস্থার প্রেক্ষিতে এই পরামর্শই দিয়েছিলেন যে মদীনার ভেতরে অবস্থান করেই যুদ্ধ করা হোক। মহানবী (সা.)-ও এই মতামতকেই পছন্দ করলেন। তবে বেশিরভাগ সাহাবা, বিশেষ করে যুবক বয়সের সাহাবীগণ যারা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি, তারা নিজেদের শাহাদাতের মাধ্যমে ধর্মের সেবা করার সুযোগ লাভ করার জন্য ব্যকুল ছিলেন, আর তারাই অত্যন্ত জোরালো আবেদন-নিবেদন করে বলেন শহরের বাইরে বেরিয়ে উন্মুক্ত প্রান্তরে যুদ্ধ করা উচিত। তারা এতটাই জোর দেয় আর নিজেদের দাবি জানায় ও মতামত উপস্থাপন করে যে, মহানবী (সা.) শেষ পর্যন্ত তাদের আবেগউদ্দীপনা দেখে তাদের কথা মেনে নেন এবং সিদ্ধান্ত প্রদান করেন, আমরা উন্মুক্ত প্রান্তরে বেরিয়ে কাফেরদের সাথে লড়াই করবো। এরপর জুমআর নামাযের পর তিনি মুসলমানদের মাঝে গণ তাহরীক করেন যেন তারা আল্লাহর পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে পুণ্য অর্জন করে।

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, প্রণেতা-হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ, এম. এ, পৃ: ৪৮৪-৪৮৫)

এই ঘটনার অবশিষ্ট বিস্তারিত ইনশাআল্লাহ্ পরবর্তিতে বর্ণনা করা হবে। ফিলিস্তিনিদের জন্য দোয়া অব্যাহত রাখবেন। যুদ্ধবিরতি শেষ হবার পর পুনরায় তাদের ওপর নির্বিচারে বোমাবর্ষণ আরম্ভ হবে আর আবারও বহু নিরীহ লোকেরা শহীদ হবে। কত বেশি অত্যাচার হবে এটা আল্লাহ্ তা'লাই ভাল জানেন। তাদের ভবিষ্যতের বিষয়ে বড় বড় পরাশক্তিগুলোর যে অভিপ্রায়, সেগুলো অত্যন্ত ভয়ানক। তাই তাদের জন্য অনেক দোয়ার প্রয়োজন। আল্লাহ্ তা'লা কৃপা করুন। (আমীন)

****

১ম পাতার পর....

মর্যাদার দিক থেকে হযরত মসীহর থেকে হীনতর ছিলেন। কিন্তু এখানে সম্মান ও মর্যাদা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে না। বরং আল্লাহ্ তা'লা একথার উল্লেখ করছেন যে, হযরত মসীহর মাঝে কোন অনন্য বৈশিষ্ট্য ছিল না। খৃষ্টানগণ যেহেতু হযরত মসীহকে অস্বাভাবিক মহত্ব দান করে থাকে এবং দাবি করে যে তাঁর মাঝে কিছু কিছু অনন্য বৈশিষ্ট্য পাওয়া যেত। এই কারণে আল্লাহ্ তা'লা এখানে সেই দাবি খণ্ডন করেছেন এবং বলেছেন যে, এই গুণগুলি হযরত এহিয়া (আ.)এর মাঝেও বিদ্যমান ছিল। এই বিষয়গুলির কারণে তোমরা যদি ঈসা (আ.) কে শ্রেষ্ঠত্ব দান কর তবে এহিয়াকে কেন শ্রেষ্ঠত্ব দাও না? (তফসীর কবীর, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১৪৮)

যুগ খলীফার বাণী

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"ব্যক্তিগত পর্যায়ে, আপনাদের উচিত নিশ্চিত করা যে, আপনারা পাঁচ ওয়াক্ত নামায নিয়মিত আদয়া করেন, আর আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য কামনায় হৃদয় নিঙড়ানো আবেগ ও আন্তরিকতা নিয়ে আপনারা সিজদাবনত হন। উপরন্তু, আপনাদের নিয়মিত নফল নামাযে অভ্যস্ত হওয়া উচিত। যখন আপনারা আস্যাইলামের শুনানির জন্য যান, তখন আদলতে প্রবেশের পূর্বে আপনাদের উচিত সূরা ফাতিহা পাঠ করা। এছাড়াও, নিজেদের অন্তরে আপনাদের এক দৃঢ় অঙ্গীকার করা উচিত যে, একবার যখন আপনাদের কেস গৃহীত হয়ে যাবে এবং আপনাদের পরিস্থিতির উন্নতি হবে, তখনও আপনারা নামাযে অধ্যবসায় ও শৃঙখলার সাথে প্রতিষ্ঠিত থাকবেন। যদি আপনারা এসব করেন তবে ইনশাআল্লাহ্, আপনারা আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহরাজি ও আশিস বর্ষিত হতে দেখবেন। "

(ভার্চুয়াল মিটিংং, মসজিল খুদ্দামুল আহমদীয়া, জার্মানী, ৬ই ডিসেম্বর, ২০২০)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir